বাতিলের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ হোন, সতর্ক থাকুন!

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

নিম্নলিখিত বয়ানটি হযরত মুফতী সাহেব হুযূর দা.বা. গত দুই মাস আগে ঢাকার হাজারীবাগস্থ আল-জামি'আ মদীনাতুল উলূম মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে পেশ করেন। বয়ানটি আওয়াম-খাওয়াছ সকলের জন্য পাথেয় বিবেচনায় পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করা হলো– সম্পাদক।

হামদ ও সালাতের পর...

আলহামদুলিল্লাহ, এই জামি'আর সম্মানিত মুহতামিম ছাহেব, অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম, মহল্লাবাসী ও আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ দৃষ্টি নাযিল হয়েছে। কেউ বলতে পারেন, মানুষ তো গায়েব জানে না, এমনকি নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামও গায়েব জানেন না তাহলে আপনি কিভাবে বললেন যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ দৃষ্টি নাযিল হয়েছে? এটা অবশ্যই শতভাগ সত্য কথা যে, মানুষ গায়েব জানে না। তবে কিছু আলামত ও চিহ্ন আছে, যার মাধ্যমে গোপন জিনিস অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেক গোপন জিনিসেরই আলামত আছে। গোপন জিনিস তো কোনদিন দেখা যাবে না, কিন্তু তার আলামত দেখা যাবে। হাদীসে এসেছে, জনৈক সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন (অর্থ:) আমার ভেতরে ঈমান আছে কি না এটা কিভাবে বুঝবো? নবীজী উত্তর দিলেন–

إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن

অর্থাৎ লক্ষ্য করে দেখো, কোন নেকীর কাজ করতে পারলে তোমার কাছে আনন্দ লাগে কি না, মনটা খুশিতে ভরে উঠে কি না। অনুরূপভাবে আল্লাহ না করুন কখনো গুনাহ হয়ে গেলে তোমার পেরেশানী হয় কি না, দুঃখ-কষ্ট হয় কি না। যদি হয়, বুঝবে তোমার ঈমান আছে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২২২০)

তো এই হাদীসে নবীজী গায়বী বিষয়ে ঈমান বোঝার আলামত বলে দিলেন। এবার ঐ প্রশ্নে উত্তর নিন– এখন আমরা আল্লাহর ঘরে বসে আছি। বলুন তো, দুনিয়াতে কারো ঘরে প্রবেশ করতে গেলে মালিকের অনুমতি লাগে কি না, তার সন্তুষ্টি লাগে কি না, নাকি বিনা অনুমতি ও বিনা সন্তুষ্টিতেই কারও ঘরে উঠে পড়া যায়? যায় না, বরং এমনটি করলে পুলিশে ধরিয়ে দেয়া হয় যে, ডাকাতি করতে এসেছে! তো দুনিয়াতে কারো ঘরে বসতে গেলে তার অনুমতি লাগে, সন্তুষ্টি লাগে। এখন বলুন, আমরা যে মাগরিবের নামায আদায় করে আল্লাহর ঘরে বসে আছি, আল্লাহর দীনের কথা, কুরআন-সুন্নাহর কথা শুনছি এর দ্বারা কী বোঝা যায়? এটা কি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হয়েছে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও খুশি ছাড়াই কি আল্লাহ আমাদেরকে বসতে দিয়েছেন? কক্ষনো নয়। সুতরাং এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নেক দৃষ্টি রয়েছে। এজন্যই তিনি আমাদেরকে অন্য সকল কাজ থেকে ফারেগ করে কিছু সময়ের জন্য তার ঘরে ইতিকাফ করার এবং কুরআন-সুন্নার আলোচনায় অংশগ্রহণ করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো তাওফীক বাড়িয়ে দিন। আ মী-ন।

মুহাতারাম হাযেরীন!

আমাদের মুরব্বীরা একে একে চলে যাচ্ছেন। এই ২০২০ সালের মধ্যে অনেক মুরব্বী চলে গেলেন। মনে হচ্ছে বাংলাদেশ যেন খালি হয়ে গেছে। হাতেগোণা কয়েকজন ছাড়া তেমন কাউকে আর দেখছি না। সর্বশেষ কয়েক দিন আগে হযরতুল আল্লাম মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী রহিমাহুল্লাহও চলে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতকে মাগফিরাতে কামেলা নসীব করুন। জান্নাতের উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। তিনি আমাকে অনেক মহব্বত করতেন। এই মাদরাসার জন্যও তার বহু অবদান আছে। আল্লাহ তার কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন!

হযরতের ইন্তেকালে দেশ-বিদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই শোকবার্তা পাঠিয়েছেন, আমিও পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা কথা ছিল, ভারতবর্ষে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ.-এর পর ইংরেজদের মোকাবেলায় মর্দে-মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেছেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ। তিনি 'ইংরেজ খেদাও' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দিনের বেলা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদের মোকাবেলা করতেন, আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ে হাদীসের সবক পড়াতেন। ঠিক তেমনিভাবে হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী রহ.-ও বাংলাদেশে বাতিলের মোকাবেলায় হযরত মাদানী রহ.-এর ভূমিকা রেখেছেন। যখনই কোন বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তিনি সঙ্গেসঙ্গে তার মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং তার শূণ্যস্থান পূরণ করে দিন।

মুহতারাম হাযেরীন!

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

(অর্থ:) তারা তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে। (সূরা আলে-ইমরান-১১৮)

এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের প্রকৃত মনোভাব ও অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গেলো। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

(অর্থ:) কাফেররা কামনা করে, তারা যেমন কাফের হয়েছে, তোমরাও তেমন কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা কুফরীতে বরাবর হয়ে যাও। সুতরাং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা নিসা-৮৯)

মোটকথা, দুনিয়ার তাবৎ কাফের-মুশরিক মনে-প্রাণে কামনা করে, আমরা যেন ইসলাম পরিত্যাগ করি, তাদের ভ্রান্ত ধর্ম ও ভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারী হয়ে যাই। আমাদেরকে কাফের বানানো তাদের প্রধান টার্গেট। এই যে আমাদের দেশে খ্রিস্টানদের পরিচালিত এনজিওগুলো কাজ করছে, হিন্দুদের পরিচালিত এনজিওগুলো কাজ করছে, এদের সবার উদ্দেশ্য আমাদেরকে ঈমানহারা বানানো। আমি একবার

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত শেরপুরে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একজায়গায় দেখলাম পাশাপাশি খ্রিস্টানদের হাসপাতাল ও গির্জা। আমি সাথীদের জিজ্ঞেস করলাম, রাস্তার পাশে এই যে হাসপাতাল ও গির্জা পাশাপাশি এর ব্যাখ্যা করুন! সাথীরা বললেন, হুযূর আপনিই বলুন! বললাম, এর সরল ব্যাখ্যা হলো– আমাদের হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নাও এবং গির্জায় এসে খ্রিস্টান হয়ে যাও। (নাউযুবিল্লাহ।)

অনেকে মনে করে এরা তো খুব সেবা দিচ্ছে। আচ্ছা! ইউরোপ-আমেরিকা, জার্মানী-অস্ট্রেলিয়ায় কি কোন গরীব মানুষ নেই? হ্যাঁ, ওসব দেশের বেশিরভাগ মানুষ হয়তো ধনী কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওসব দেশেও লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র, অন্নহীন মানুষ আছে। সেখানেও লক্ষ লক্ষ হোমলেস (গৃহহীন) মানুষ ভূগর্ভস্থ ড্রেনের ভেতর রাত্রিযাপন করে। তাহলে নিজেদের দেশ বাদ দিয়ে সাতসমুদ্র তেরোনদী পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশের গরীব মানুষ বিশেষত পাহাড়ী এলাকা ও সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য তাদের দরদ উথলে উঠছে কেন? বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সেবা দিচ্ছে কেন? মনে রাখবেন, কোন কাফের হীনস্বার্থ ছাড়া মুসলমানদেরকে এক কপর্দকও দান করে না। এই এনজিওগুলোর মাকসাদ একটাই, বাংলাদেশের পাহাড়ী ও সীমান্ত এলাকার লোকজনকে খ্রিস্টান বানিয়ে সেগুলো দখল করা এবং দেশের স্বাধীনতা ছিনতাই করা। যাই হোক, তারা সেবার ছদ্মবেশে আমাদের ঈমান ও দেশ কিনে নিচ্ছে। তাদের পাল্লায় পড়ে ইসলাম সম্পর্কে বে-খবর কোন মানুষ খ্রিস্টান হলে তারা তার রানের উপর একটা সিল মেরে দেয়। এই সিল এমনভাবে দেয়া হয় যা জীবিত থাকতে কোনাদিন মুছবে না। অতঃপর যখন এই লোকটি মারা যায় তখন তারা রানের অমোচনীয় সিল দেখিয়ে তার লাশ নিয়ে যায়। আত্মীয়–স্বজনেরও তখন করার কিছু থাকে না। এই এনজিওগুলো নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য এমন এলাকা বেছে নেয় যেখানে মানসম্মত কোন মাদরাসা নেই, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত নেই, বড় কোন আলেম নেই এবং বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্য ও মঙ্গাপীড়িত। উদারহণস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম, রংপুর, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শেরপুর ইত্যাদি। এ অঞ্চলগুলোতে এনজিওরা বিভিন্নভাবে কাজ করছে। কেউ খ্রিস্টান বানাচ্ছে, কেউ কাদিয়ানী বানাচ্ছে। অথচ মুসলমানমাত্রই একথা জানা ও মানা উচিৎ যে, আমাদের নবীর পর কোন নবী হতে পারে না। এমনকি কেউ যদি নবী হওয়ার দাবী করে এবং তাকে কেউ বলে যে, 'আপনি যে নবী তার দলীল পেশ করুন' তাহলে দলীল তলবকারী কাফের হয়ে যাবে। কারণ কারও কাছে দলীল চাওয়ার অর্থই হলো, আপনি যদি দলীল পেশ করতে পারেন তাহলে আপনার দাবী মেনে নেবো আর দলীল পেশ না করতে পারলে আপনার দাবী মানবো না। সুতরাং কেউ নবী দাবী করলে তার কাছে দলীলই চাওয়া হবে না। হাজার দলীল পেশ করলেও সে বিনা দলীলে কাফের। অথচ এই কাদিয়ানীরা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী মানে না; বরং তাদের গুরু গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী মানে। পাকিস্তানের প্রধান মুফতী ও তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের লেখক হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. আমাদের নবী যে শেষনবী এর প্রমাণস্বরূপ কুরআনে কারীমের একশত আয়াত ও দুইশত হাদীস একত্র করেছেন। তার সেই কিতাবের নাম 'খতমে নবুওয়্যাত'।

মুহতারাম হাযেরীন!

কাদিয়ানীরা পঞ্চগড় এলাকাকে প্রায় দখলই করে ফেলেছে। অথচ আমরা গভীর নিদ্রায় অচেতন রয়েছি। আরবদের ভূমি দখল করে দস্যু ইয়াহুদীরা যেমন ইজরাইল বানিয়েছে, এই এনজিওরাও তেমন আমাদের পঞ্চগড়কে আরেকটি ইজরাইল বানাতে চায়। এভাবে সবখানেই বাতিল ছেয়ে গেছে। অথচ আমাদের একটুও পেরেশানী নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের আঘাত সহ্য করে, দান্দান মুবারক শহীদ করে এবং এরকম হাজারো কষ্ট স্বীকার করে উম্মতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর ওরা জনপ্রতি মাত্র বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী বানাচ্ছে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। আবার কাউকে শুধুমাত্র একটি গরু বা সেলাই মেশিন দিয়ে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। ওরা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। বলছে, কাদিয়ানী হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কাদিয়ানী হওয়া তো হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলীর মতো একটা সাধারণ ব্যাপার! তোমরা হানাফী হয়েও যেমন হানাফী মুসলমান থাকো তেমনি কাদিয়ানী হলেও তোমাদের নাম হবে 'আহমদী মুসলমান'। আর খ্রিস্টানরা বলছে, তোমরা হবে 'ঈসায়ী মুসলমান'। কতো বড় ধোঁকা ও জালিয়াতি! ঈসায়ী শব্দের অর্থই হলো খ্রিস্টান। তাহলে বলুন তো, কেউ কি একই সঙ্গে 'খ্রিস্টান-মুসলমান' হতে পারে অথবা একই সময়ে 'কাফের-মুসলমান' হতে পারে? কিংবা একই সময়ে মোটা-চিকন হতে পারে? পারে না। কারণ কুফর আর ইসলাম একসঙ্গে একত্র হতে পারে না। অথচ কাদিয়ানী খ্রিস্টান দুই দলই কাফের।

খ্রিস্টান এনজিওগুলোর প্রতারণার আরেকটি পদ্ধতি হলো, তারা ভোলাভালা মুসলমানকে কুরআন মাজীদের সূরা তাওবার একটি আয়াত– '(অর্থঃ) হে নবী! আপনি 'তাদের জন্য' ক্ষমাপ্রার্থনা করেন আর না-ই করেন, এমনকি যদি সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না'– দেখিয়ে ধোঁকা দেয় যে, দেখো! মানুষমাত্রই তো গুনাহ করে; কিন্তু গুনাহগারদের জন্য যখন আল্লাহ তোমাদের নবীর সুপারিশও কবুল করবেন না তাহলে তাঁর উম্মত হয়ে তোমাদের লাভ কী? পক্ষান্তরে আমরা যতো পাপই করি আমাদের নবী যিশুর সকল সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন!

অথচ, তারা এই আয়াতের যে ব্যাখা করছে সেটা সঠিক নয়, বিলকুল গলদ। গলদটা হলো, তারা 'তাদের জন্য' শব্দটি দ্বারা গুনাহগার মুসলমান উদ্দেশ্য নিয়েছে। অথচ আয়াতে কারীমায় 'তাদের' বলে মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে বোঝানো হয়েছে। আর সে ছিল ইসলামের চরম দুশমন, কাট্টা কাফের। তো সহজ কথা, যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে কাফের তাকে আল্লাহ কেন ক্ষমা করবেন? মোটকথা, এই আয়াতটি বিশেষ একজন তথা কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, গুনাহগার ঈমানদারের জন্য নয়।

মুহতারাম হাযেরীন!

খ্রিস্টানদের কাছে যে বাইবেল আছে এবং যেটাকে তারা আমাদের দেশে 'ইঞ্জিল শরীফ', 'কিতাবুল মুকাদ্দাস' ইত্যাদি নামে ছাপিয়ে থাকে–এর এগারোটি ভার্সন আছে। এগুলোর লেখক চারজন– মথি, মার্ক, লুক, ইউহান্না। এখানেও আছে বহু ষড়যন্ত্র ও শুভঙ্করের ফাঁকি! একটা ষড়যন্ত্র হলো– খ্রিস্টানরা নিজেরা এগুলোকে বাইবেল নামে অভিহিত করে আর মুসলমানদের কাছে যেহেতু ইঞ্জিল ও

শরীফ শব্দটি পরিচিত এজন্য তাদের কাছে ইঞ্জিল শরীফ নামে পরিচয় দেয়। অনুরূপভাবে তারা নিজেরা নবীদের নামগুলোকে মোশি, নোয়া, ডেভিড, যিশু, শলোমন, আইজ্যাক, যোসেফ, জ্যাকব ইত্যাদি উচ্চারণ করে কিন্তু বাইবেলের অনুবাদে মুসলমানদের কাছে পরিচিত শব্দ দ্বারা যথা: মূসা, নূহ, দাঊদ, ঈসা, সুলাইমান, ইসহাক, ইউসুফ, ইয়াকুব ইত্যাদি নামে পরিবেশন করে। ফলে সাদাসিধা মুসলমান মনে করে এটাও হয়তো মুসলমানদের কোন ধর্মীয় গ্রন্থ!

বলছিলাম, বাতিলপন্থীরা আমাদের দেশটাকে ষড়যন্ত্রের আখড়া বানিয়ে রেখেছে। লোকেরা দুনিয়ার সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে দলেদলে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে বোঝানোর মতো এবং তাদের পেছনে মেহনত করার মতো কোন উপযুক্ত লোক নেই।

এ জন্য আমি সব সময়ই বলি, যে সব মাদরাসায় উপরের জামা'আতের ছাত্র আছে, তারা ছুটিতে তাবলীগে বের হবে এবং ঐ সব সীমান্ত এলাকায় রোখ নিবে। ঐ এলাকার মুসলমানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। তাদের খোঁজ-খবর নিবে। তাদেরকে যে ভুল বুঝানো হয়েছে সেগুলোর সন্তোষমূলক জবাব দিবে। এই কাজের জন্য প্রত্যেক মাদরাসায় তাখাসসুস খোলা দরকার। তাখাসসুস সমাপন করা বিশেষজ্ঞ মুফতী, মুহাদ্দিসগণ কুরআন, হাদীস ও ফিকহের মাধ্যমে কাদিয়ানীদের খণ্ডন করতে পারবে। খ্রিস্টানদের জালিয়াতির মুখোশ উন্মোচন করতে পারবে। তাখাসসুস করা থাকলে ওদের কথাবার্তায় কোথায় কি গড়মিল, কোথায় কি সমস্যা– সব তার নখদর্পণে থাকবে। তখন সে ঐ সব এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে সহজে বুঝাতে পারবে।

ফিরে আসি আগের কথায়, উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররা কামনা করে মুসলমানরা যেন কাফের হয়ে যায়। আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

(অর্থ:) হে নবী! ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা কিছুতেই তোমার প্রতি খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। (সূরা বাকারা-১২০)

তুর্কিস্তান একটি মুসলিম দেশ। এর একাংশ পড়েছে ইউরোপে, একাংশ এশিয়ায়। তুর্কি শাসকরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হতে বহু বছর ধরে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ইউরোপ তাদেরকে নিজেদের মধ্যে শামিল করছে না। কারণ তারা মুসলমান। আর মুসলমানদেরকে তো বিশ্বাস করা যায় না! পক্ষান্তরে আজ যদি তুর্কি মুসলমানরা ইসলাম ছেড়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়, তারা সাথেসাথে এদেরকে নিজেদের দলে শামিল করে নিবে। এজন্য মুসলমানদেরকে সবসময় একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে, الكفر ملة واحدة অর্থাৎ মুসলমানদের মোকাবেলায় সকল কাফের এক ধর্মাবলম্বী। দেখুন না, দুনিয়াতে কতো ধর্ম ও মতের মানুষ বিদ্যমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, শিয়া, আগাখানি, কাদিয়ানী আরও কতো কি! কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবাই একাট্টা। ঠিক যেন রসুনের কোষ; ভিন্নভিন্ন হলেও মূলে এক। সুতরাং কোন কাফেরকে নিজেদের বন্ধু মনে করা যাবে না। আল্লাহ ত'আলা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন–

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

(অর্থ:) হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদের ছাড়া কোন ইয়াহুদী-খ্রিস্টানকে বন্ধু বানাবে না। (সূরা আলে-ইমরান–২৮)

অথচ বর্তমান মুসলিমবিশ্বের শাসকবৃন্দ বিশেষত আরব দেশগুলো এই নির্দেশের কি পরিমাণ নাফরমানী করছে। আরবশাসকদের মধ্যে আবার সৌদিশাসকরা আরেক কাঠি সরস। সৌদি রাজপরিবার তো ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পায়ে সিজদায় পড়ে আছে। এরা নিজেদের গদির স্বার্থে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ছাড়া কিছুই বুঝে না। এমন বহু অভিযোগ আছে যে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের তাগিদে মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে। অতঃপর সেই ইয়াহুদ-নাসারাদের মেয়েরা মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঘরে এসে গোয়েন্দাগিরি করে। সব খবর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কাছে পাচার করে। আর এদের পেট থেকে যে সন্তান হয় তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরবর্তীকালে ক্ষমতায় বসায়, যারা কিনা ইয়াহুদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। বর্তমান সৌদি যুবরাজের দিকেই দেখুন। অভিযোগ আছে, তার মা একজন ইয়াহুদী। তার মা ইয়াহুদী হোক আর নাই হোক, সে-তো পাক্কা ইয়াহুদীদের তরীকায় দেশ চালাচ্ছে। সৌদির সব ডিপার্টমেন্টে মহিলাদের বসিয়েছে। তাদেরকে অফিস-আদালত ও দোকানপাটে চাকরি দিচ্ছে। সিনেমা হলের অনুমোদন দিয়েছে। নর্তকীদের দিয়ে উদ্দাম নাচগানের আয়োজন করছে। হালাল পতিতালয় চালু করেছে। পর্যটনের নামে পুরো দেশটাকে যিনা-ব্যভিচারের আখড়া বানানোর পাঁয়তারা করছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইজরাঈলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছে। আল্লাহর লানত পড়ুক ওর উপর! ও কোন পথে চলছে!! শুধু সে-ই নয় আরবের অনেক দেশের শাসকরাই এখন ইজরাঈলকে স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করছে। আল্লাহ এদের থেকে মুসলামনদের ঈমান ও মুলক হেফাজত করুন।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কট্টর শত্রুদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। সূরা মায়িদা-এর ৮২ নং আয়াতে বলেছেন, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন দু'টি– ১. ইয়াহুদী ২. মূর্তিপূজক। বর্তমানে সেটা হলো ইজরাইল ও ভারত। এ দু'টি দেশই এখন আমাদের সবকিছুর হর্তাকর্তা সেজে বসেছে। একটি দেশ একেবারে খুল্লমখোলা আর অপরটি আড়ালে-আবডালে। তাদের বিরুদ্ধে কেউ টু-শব্দটি বললেও সে গুম-খুনের শিকার হয়। এই হল বর্তমান পরিস্থিতি। যে-ই সত্যের পক্ষে মুখ খুলবে সেই লা-পাত্তা।

যাই হোক, এই হাদীসে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা খানা খাওয়ার জন্য একে অপরকে যেভাবে দস্তরখানের দিকে ডাকাডাকি করো, তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ঠিক সেভাবে এক কাফের আরেক কাফেরকে ডাকতে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া-রাসূলাল্লাহ! আমরা কি সেই যামানায় সংখ্যায় কম হবো? তিনি বললেন, না, তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আদর্শ থাকবে না। ফেতনার স্রোতে তোমরা কচুরিপানার ন্যায় ভেসে যাবে। স্রোত যে দিকে যায় কচুরিপানাও সে দিকে যায়। আবার স্রোত উল্টো দিকে আসলে কচুরিপানাও উল্টো দিকে চলে। কচুরিপানার কোন ইচ্ছাধিকার থাকে না, তার কোন শরীয়ত থাকে না । মুসলমানও আজ কচুরিপানার ন্যায় হয়ে গেছে; কখনো গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টানদের বড় দিনে প্রার্থনা করে। আবার কখনও মন্দিরে গিয়ে পূজোয়

শরীক হয়। তাদের সঙ্গে মদও খায়, শুকরও খায়। মোটকথা, এই হবে মুসলমানদের হালত ও অবস্থা। তাদের সামনে নবীর আদর্শ থাকবে না। অতঃপর নবীজী বলেন, আর তোমাদের দিলের মধ্যে 'ওয়াহান' ঢেলে দেওয়া হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ওয়াহান কী জিনিস? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ১. দুনিয়ার মোহ। অর্থাৎ পদের মোহ, সম্পদের মোহ, নারীর মোহ। যে কেউ এর কোন একটায় আটকে গেছে সে-ই দুনিয়ার মোহে আটকে গেছে। ২. মৃত্যুকে অপছন্দ করা। আখেরাতে বিশ্বাসী কোন মুসলমান কি মৃত্যুকে অপছন্দ করতে পারে? না, কক্ষনো নয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

(অর্থ:) যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৫০৭)

এ কারণেই মুমিনের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা তার সামনে প্রথমে জাহান্নাম পেশ করেন, তারপর জান্নাত পেশ করেন। এরপর বলেন, এই জান্নাত হলো তোমার ঠিকানা। তখন সেই মুমিন ব্যক্তি জান্নাতের জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। বলতে থাকে, আমাকে আর দুনিয়াতে রেখো না, আমাকে আমার ঠিকানায় পৌঁছে দাও। আল্লাহ বলেন, এই ঠিকানায় পৌঁছতে হলে একটি সেতু পার হয়ে আসতে হবে, যার নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুসেতু পার হলেই জান্নাতে পৌঁছতে পারবে। তখন বান্দা বলে, তাহলে আমাকে মৃত্যুই দিয়ে দিন। দেখুন, প্রথমে সে চাচ্ছিলো জান্নাত আর এখন চাচ্ছে মৃত্যু। পক্ষান্তরে যারা কাফের তাদের মৃত্যুর সময় আগে জান্নাত দেখানো হয়, তারপর জাহান্নাম দেখানো হয়। এরপর বলা হয়, এই জাহান্নামই তোর চিরঠিকানা। তখন তার রূহ শরীর থেকে বের হতে চায় না। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কাফেরের মৃত্যুর উপমা পেশ করেছেন। বলেছেন, ভেড়ার পশম এমনিতেই জট পাকানো থাকে। উপরন্তু তা যদি হয় ভেজা এবং এর মধ্যে যদি বরশির মতো বাঁকা লোহার হুক ঢুকিয়ে টানা হয় তখন সেই হুকটি যেমন সহজে বের হয় না এবং সজোরে টান দিলে পশম ছিড়ে বের হয়ে আসে, ঠিক তদ্রুপ কাফেরদের রূহ জাহান্নাম দেখার পর বের হতে চায় না। তখন হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম কাফেরদের রূহকে পশম টানার মতো টেনে-হিঁচড়ে বের করে নেন।

যাই হোক, উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে, আমাদেরকে খতম করার জন্য এক কাফের আরেক কাফেরকে ডাকতে থাকবে। এর কারণ হলো, তোমরা আমার সুন্নাত তথা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। নবীজী আরেকটা কারণ বলেছেন যে, তোমরা পদ-পদবীর মোহে, সম্পদের মোহে এবং নারীর মোহে পড়বে। তিন নাম্বার কারণ বলেছেন, তোমরা মৃত্যুকে ভয় পাবে।

মুহতারাম হাযেরীন!

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রাণীর মৃত্যুর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। নির্দিষ্ট সে সময়ের এক সেকেণ্ড আগেও মৃত্যু আসবে না এবং সময় হয়ে গেলে এক সেকেণ্ড থাকাও যাবে না। আবার মৃত্যুও দু'ভাবে হতে পারে; ঘরে বা হাসপাতালে বিছানায় শুয়েশুয়ে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে। একজন ঈমানদারের জন্য এই দুই মৃত্যুর মধ্যে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের মৃত্যু হাজার গুণে উত্তম। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কেউ জিহাদে গেলেই শহীদ হয়ে যাবে। বরং আল্লাহ যাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন কেবল সেই লাভ করতে পারে এই মহামর্যাদা!

মোটকথা, এই হাদীস থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে, সর্বাবস্থায় নবীজীর আদর্শের উপর কায়েম থাকতে হবে। কিন্তু আমরা নানাভাবে কাফেরদের আদর্শ গ্রহণ করছি। একদিকে আমরা ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে ওয়াজ করছি, আবার নিজেরাই অকারণে ছবি তুলছি, ভিডিও বানাচ্ছি। ভাস্কর্য যেসব কারণে হারাম সেগুলোর বেশিরভাগই ছবির মধ্যেও বিদ্যমান। যাই হোক, এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মুসলমানরা নবীজীর সুন্নাহ ও জীবনাদর্শ থেকে হটে যাবে। হ্যাঁ, অবস্থা যতোই নাযুক হোক, সংখ্যায় নগণ্য হলেও মুসলমানদের একটা দল সবসময় দীন ও শরীয়তের উপর দাঁতকামড়ে অটল থাকবে। এদের সাথে আল্লাহর মদদ ও নুছরত থাকবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لا تزال طائفة سن أمتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

(অর্থ:) আমার উম্মতের একটা দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর কায়েম থাকবে। কারও জুলুম অত্যাচার তাদেরকে হক ও সত্য হতে হটাতে পারবে না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২১৯২)

মুহতারাম হাযেরীন!

আমাদের কর্তব্য হলো, শত কষ্ট হলেও ঐ দলটিকে খুঁজে বের করা এবং তাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা। নবীজীর সুন্নাত থেকে একইঞ্চি পরিমাণও বিচ্যুত না হওয়া। আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে, আমাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক, আর জেলেই পোরা হোক ঈমান-আকীদার প্রশ্নে হক ও হক্কানিয়ত থেকে একচুলও সরবো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– (অর্থ:) সাপ যেমন দিনশেষে অথবা শত্রুর আঁচ পেলে গর্তে ঢুকে যায়, ঈমানও এক সময় মদীনায় ফিরে যাবে।

ইসলামের সূতিকাগার ও আদিনিবাস হলো মদীনা তাইয়িবা। যখন দুনিয়ার সবাই একাট্টা হয়ে ইসলামকে ধ্বংস করতে আসবে তখন ইসলাম মদীনায় চলে যাবে। দীনে ইসলাম আপাদমস্তক কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও এই হাদীসে তাকে ক্ষতিকর সাপের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে। এই তুলনা সর্বদিক দিয়ে নয়; বরং শত্রুকবলিত সাপের অসহায়ত্বের সঙ্গে। আবার সাপ যখন বিপদ আঁচ করে নিজের গর্তে ঢুকে যায় তখন তাকে বের করা যায় না! হাদীসে বলা হয়েছে, একসময় ইসলাম এবং মুসলমানদের অবস্থাও শত্রুকবলিত সাপের মতো হবে। সবাই তাকে মারতে আসবে। মুসলমান হওয়াটাই যেন অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে। অন্য কোন অন্যায় না থাকলেও মুসলমানকে মার খেতে হবে। অনুরূপভাবে কোন দেশ থেকে ইসলাম যদি মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন শুরু করে, তখন আর রক্ষা করা যাবে না। মাদরাসা বানিয়েও না, ছেলেকে আলেম বানিয়েও না। সুতরাং হে মুসলমান ভাইয়েরা এখনও সময় আছে। আমরা সচেতন হই, হুশিয়ারির সঙ্গে চলি। নিজেদের সবকিছু দিয়ে হলেও ইসলামকে জীবনের সকল অঙ্গনে ধরে রাখার চেষ্টা করি। ইসলাম রওয়ানা হয়ে গেলে আমরা যতোই কুরবানী পেশ করি ধরে রাখা যাবে না।

মুহতারাম হাযেরীন!

এতোক্ষণের আলোচনা শুনে কেউ আবার ঘাবড়ে যেতে পারি যে, তাহলে তো বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরা ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই! না, আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং নিজেদের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর দীনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করেছেন–

(২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নবীন উলামায়ে কেরামের খেদমতে বিশেষ নিবেদন

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.

(গত ৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী, বুধবার জামি'আ দারুল উলূম করাচীর 'দারুল কুরআন' ভবনে আসাতিযায়ে কেরামের উদ্দেশে তরবিয়তী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন। এটি দারুল উলূম করাচীর মুখপাত্র 'মাহনামা আল-বালাগ'-এ ছেপেছিলো। ব্যাপক ফায়দার কথা ভেবে তার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করা হলো।)

. . .

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

হযারাত আসাতিযায়ে কেরাম!

প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে যতোই শোকরিয়া আদায় করি, কম হয়ে যাবে। তিনি আমাদের প্রতি সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ করে দীনী ইলমের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। বস্তুত আমরা তার এই অনুগ্রহের জন্য যতো বেশিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, শেষ হবার নয়। দুনিয়াতে তো আরও কতো ব্যস্ততা আছে, চাকুরী-বাকুরী আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার দীনের চাকর বানিয়ে রেখেছেন। আমাদের রুটি-রুজির ব্যবস্থাও এখান থেকে করছেন। এটা তার ফযল ও করম বৈ কী হতে পারে? হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর একটি কথা আমার সবসময় মনে পড়ে। এ ধরনের একটি মজলিসে তিনি বলেছিলেন– তাবলীগ জামা'আতের লোকদেরকে দেখো, তারা কিভাবে নিজের পরে, নিজের খেয়ে দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য সফর করেন, শত কষ্ট বরদাশত করেন এবং এতোকিছু স্বীকার করেই তারা উম্মত পর্যন্ত দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর যিম্মাদারী আদায় করেন। এরপর তিনি আমাদেরকে বলেন, লক্ষ্য করে দেখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কতো রকম কষ্ট থেকে হেফাযত করেছেন। তোমার নিজের পকেটের টাকা খরচ থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি তোমাদের কাছে ছাত্রদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর তোমরা শুধু তাদেরকে সহীহ তা'লীম দাও, তরবিয়ত করো এবং তাদের ইসলাহের ফিকির করো।

বাস্তব কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে দীনের খাদেম হিসেবে কবুল হওয়ার জন্য আমরা সবাই মুখাপেক্ষী। দীনের খেদমতে আমাদের এই অংশগ্রহণ তো আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমরা এই খেদমতের মুহতাজ, খেদমত আমাদের মুহতাজ নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট কূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন কষ্ট করে আমাদেরকে কূপের কাছে যেতে না হয়। সুতরাং এখন আমাদের যিম্মাদারী হচ্ছে, তাদের খেদমত করে একজন সাচ্চা মুসলমান, নেক ইনসান এবং ভালো আলেম হিসেবে গড়ে তোলা। আব্বাজান রহ.-এর এই কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা দরকার।

তা'লীমের সাথেসাথে তরবিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরী

আব্বাজান রহ. বলতেন, একজন উস্তাদের কাজ কেবল এতোটুকুই নয় যে, তিনি দরসে শানদার কিছু তাকরীর করে ফারেগ হয়ে যাবেন; বরং তাকে ছাত্রদের তা'লীমের পাশাপাশি তাদের আমল-আখলাক এবং ইসলাহের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্রদের বাহ্যিক তা'লীমের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই হবে না বরং আমলী তরবিয়তের নেগরানীও উস্তাযের যিম্মাদারী। বস্তুত এটাই দুনিয়াবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আমাদের দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঝে মৌলিক পার্থক্য। এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

আমরা আমাদের যে সব আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের পদাঙ্ক অনুসরণের দাবী করি তাদের তরীকা এটাই ছিল যে, তারা ছাত্রদেরকে কেবল তা'লীম-তরবিয়তের হুকুম করতেন না বরং স্বয়ং নিজেদের তা'লীম-তরবিয়ত, আমল আখলাক দ্বারা ছাত্রদেরকে নেক ইনসান, সাচ্চা মুসলমান এবং যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তুলতেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে এমন সব অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার বুকে আর কোন প্রতিষ্ঠানের নেই।

দরসের যিম্মাদারী মূলত একটি প্রতিশ্রুতি

আব্বাজান রহ.-এর মূল্যবান কথাগুলো মূলত আমি নিজের ফায়দার জন্য বারবার বলছি এবং মুযাকারা হিসেবে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। আব্বাজান প্রায়ই একটি কথা বলতেন, কোন উস্তাদ দরসের যিম্মাদারী নেয়া মানে ছাত্র ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ আমি এই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি যে, আমি ছাত্রদের হক আদায় করে সবক পড়াবো। সুতরাং আসাতিযায়ে কেরামকে সবসময় এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, আমার উপর একটি মহৎ যিম্মাদারী অর্পিত হয়েছে, আমাকে সেটা পালন করতে হবে। চাই তিনি বেতন গ্রহণ করেন কিংবা না করেন। কেননা দীনী মাদরাসায় বেতন তো আর আমাদের আসল মাকসাদ নয়। বেতন কেবল প্রয়োজনের খাতিরে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এটা কোন মুখ্য বিষয় নয় এবং শিক্ষকতার জন্য অপরিহার্যও নয়। আর যেটা জরুরী নয় সেটা থেকে মানুষ চাইলে হাত গুটিয়েও নিতে পারে। মোটকথা, যখন কোন কিতাব আমি পড়ানোর যিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছি, আমি ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেলাম যে, আমি তোমাদেরকে পড়াবো। আর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করছি যে, আমি আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক পড়াবো। এখন যদি আমি কোন ত্রুটি করি, ছাত্রদের হক আদায় না করি, যতোটুকু মুতালা'আ করা দরকার ছিলো তা না-করি, যতোটুকু সময় দেয়া উচিৎ ছিলো, না-দেই তবে তো আমি তাদের হক নষ্ট করলাম। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলাম। আল্লাহ তা'আলার হকও আমি বিনষ্ট করলাম।

উস্তাদদেরকে আত্মসমালোচনামূলক মুহাসাবা বা হিসাব নিতে হবে

আব্বাজান রহ. বলতেন, প্রত্যেক উস্তাদের নিয়মিত নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে হিসেব-নিকেশ করা উচিত যে, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি কতোটুকু

পালন করছি, ছাত্রদেরকে কতোটুকু সময় দিচ্ছি। যদি আমি আমার দায়িত্বে ত্রুটি করি তবে আমার ছাত্ররাও আমার থেকে তাই শিখবে এবং পরবর্তীকালে তাদের যিন্দেগীতে এর প্রতিফলন ঘটবে। ব্যস, কথা এতোটুকুই যে, যে মহান যিম্মাদারী আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি সেটা খুব করে ইয়াদ রাখা।

মাঝেমধ্যে নিজের নিয়ত যাচাই করা

আব্বাজান রহ. আরো বলতেন, কখনো এমন হয় যে, কাজ শুরু করার সময় নিয়ত পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু ধীরেধীরে, সময়ের পরিবর্তনে সেখানে ঘাটতি দেখা দেয়। শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। দিলে ওয়াসওয়াসা জন্ম নিতে থাকে। এমনকি– আল্লাহ হেফাযত করেন– ফাসেদ ও পাপাসক্ত চিন্তা-ভাবনা গ্রাস করে নেয়। তখন মানুষকে তার আসল মাকসাদের উপর মজবুত ও সুদৃঢ় থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। সে জন্য মাঝেমধ্যে নিয়তকে তাজা করা এবং আসল মাকসাদকে ইয়াদ করা চাই।

আমি আমার নিজেকে যাচাই-বাছাই করতে থাকি, অন্যকে যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর দু'টো বিশেষ নসীহত–

(১) ছাত্ররা আপনার দরস বোঝে কিনা?

আব্বাজান প্রায় সময় আমাদেরকে বলতে থাকতেন, আপনার দরস ছাত্ররা বোঝে কি না তার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন যেন না হয়, আপনি গৎবাঁধা কতোগুলো তাকরীর করে চলে গেলেন আর ছাত্ররা কিছুই বুঝল না। সুতরাং উস্তাদ কিতাব পড়ানোর সাথেসাথে যাচাই-বাছাই করেও দেখবেন, আপনার এই দরস থেকে আপনার ছাত্ররা কতোটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছে। যদি কেউ তুলনামূলক দুর্বল হয়, তার সঙ্গে শফকত ও স্নেহের আচরণ করবেন, তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

(২) ইজরা ও অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বারোপ।

ছাত্রদেরকে কিতাবের কাওয়ায়েদ ও মাসাইল তাত্ত্বীক তথা বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন। কখনো উস্তাদ ছাত্রদেরকে কাওয়ায়েদ ও মাসাইল পড়িয়ে দেন কিন্তু তামরীন তথা অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব দেন না। এতে করে ছাত্ররা ইস্তিলাহাত, কাওয়ায়েদ ও মাসাইল তো বুঝে যান কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োগে এসে আটকে যান। উদাহরণস্বরূপ 'নাহব'-এর কথাই ধরুন। ছাত্ররা শরহেজামী পর্যন্ত নাহব পড়ে। কাফিয়া, শরহেজামী পড়ে ফেলে অথচ আসল মাকসাদ–

الاحتراز في الكلام عن الخطأ اللفظي

কিছুই হাসিল হয়নি। ইবারত সহীহ পড়তে পারে না। আরবীতে দুই-চারটা বাক্য লেখা মুশকিল মনে হয়। এটা কেবল এজন্যই যে, কিতাব পড়ানোর সাথেসাথে আমলী ইজরা ও তামরীন হয় না। এটা আমাদের অনেক বড় কমযোরী ও দুর্বলতা। ছোটবড় নির্বিশেষে বেশিরভাগ মাদারিসের প্রায় একই হালত। উলামায়ে দেওবন্দের ইতিহাস পড়ে দেখুন, তারা সবাই এই কিতাব পড়েই আলেম হয়েছেন। কিন্তু তাদের যখনই আরবী বলা বা লেখার উপলক্ষ আসতো, বুক চিতিয়ে সটান দাঁড়িয়ে যেতেন।

একবার হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী এবং হযরত মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ রহ. হজ্জের সফরে গেলেন। তখনকার সৌদি বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সাউদের মামুল ছিলো, তিনি হজ্জে আগত উলামায়ে কেরামকে শাহীদরবারে আমন্ত্রণ জানাতেন। সেখানে ইলমী, আমলী মুযাকারাও হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত উলামায়ে কেরামকে বক্তব্য রাখার জন্য আবেদন করা হতো। হিন্দুস্তান থেকে তখন হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী এবং হযরত মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ সাহেবকে বাদশাহর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তখন সেখানে রওয়ায়ে আতহার ছাড়া অন্য সব কবরের উপর থেকে গম্বুজ ভেঙে দেয়া হয়েছিলো। এই নিয়ে গোটা দুনিয়ায় তখন আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠলো যে, সৌদি সরকার বুযুর্গদের কবরকে অপমান করেছেন। সুতরাং এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সেখানে উলামায়ে দেওবন্দের ই'তিদাল বা মধ্যপন্থার সাথে স্বীয় মাসলাক তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিলো। উলামায়ে দেওবন্দ একদিকে কবরের উপর গম্বুজ বানানোর পক্ষে নন, অন্যদিকে কবরের যথাযথ সম্মান রক্ষা করাও মাসলাকে দেওবন্দের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেমিনারের একপর্যায়ে আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.-কে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হলো। ইতোপূর্বে তিনি আর কখনোই আরবীতে এভাবে বক্তব্য দেননি। কিন্তু তিনি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় সাবলীলভাবে উপস্থাপন করলেন। তার কিছু অংশ আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানীর খুতুবাতে উসমানী অথবা তাজাল্লিয়াতে উসমানীতে ছাপা হয়েছে। হযরতের হৃদয়গ্রাহী ফিকহী আলোচনা ও সাবলীল উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে বাদশাহ উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি দারুণ প্রভাবিত হলেন।

আমি বলতে চাচ্ছি, তখন তো আজকালের মতো নিয়মতান্ত্রিক মুকালামা, আরবী কথোপকথনের ক্লাস ছিলো না। কিন্তু সময় মতো এভাবেই তারা বারুদের মতো জ্বলে উঠতেন। বিশুদ্ধ আরবী, মনকাড়া বাচনভঙ্গি, বিরোধপূর্ণ মাসাইলের দালীলিক আলোচনার মাধ্যমে রাজদরবার কাঁপিয়ে দিতেন। আর যখন কলম উঠিয়েছেন, ফতহুল মুলহিম লিখে গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

এজন্য বলছি, তামরীন, ইজরা এগুলো নতুন কোন বিষয় নয়৷ এটি আমাদের আকাবিরদের তা'লীম-তরবিয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। বিশেষ করে ইবতিদায়ী জামা'আতসমূহে তো এর প্রতি অবহেলার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

ইবতিদায়ী জামা'আতে কিতাব পড়ানোর পদ্ধতি

আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ সাহেব রহ. বলতেন, ছাত্রদের তা'লীমের প্রথম দুই-তিন বছরের আসল কাজ হচ্ছে বিশুদ্ধ আরবী শেখা। সুতরাং সেভাবেই তাদেরকে তা'লীম দিবে। উস্তাদজী গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলতেন, তুমি যদি কুদূরীও পড়াও সেখানেও মনে করবে কুদূরীর আসল মাকসাদ ফিকহ নয়; বরং আসল মাকসাদ নাহব-সরফের ইজরা বা অনুশীলন। যদিও কুদূরী কিতাব ফিকহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। উস্তাদজীর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি সংক্ষিপ্তাকারে কিতাবের মাসআলা বুঝিয়ে দাও কিন্তু ইবারতের উপর পরিপূর্ণ জোর লাগাও যেন ছাত্ররা সহীহভাবে ইবারত পড়তে পারে। ভুল করলে তাকে দিয়েই শুদ্ধটা বের করে আনো। এভাবে কুদূরী কিতাবেও নাহব-সরফের ইজরা করাবে।

আর বর্তমানে কি হচ্ছে? ছাত্রদেরকে হেদায়াতুন্নাহব পড়ানো হচ্ছে, যার আসল মাকসাদ নাহবের মাসাইল ভালোভাবে আত্মস্থ করিয়ে দেয়া এবং বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে তার অনুশীলন করানো। কিন্তু আজকাল অনেক উস্তাদ কাফিয়া, দিরায়াতুন্নাহব এবং

হিদায়াতুন্নাহবের বিভিন্ন শরাহ মুতালা'আ করে এসে ঢের তাকরীর শুরু করে দেন। অথচ ছাত্ররা সহীহ-শুদ্ধভাবে ইবারতটুকুও পড়তে শিখেনি। ফলশ্রুতিতে আসল মাকসাদ ব্যাহত হচ্ছে। আমি তো মনে করি, কাফিয়া কিতাবেও উস্তাদকে কিতাব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ, শরহেজামীর আলোচনায় যাওয়া উচিৎ নয়। অথচ অনেক উস্তাদ তা-ই করেন; কাফিয়ার দরসে শরহেজামীর তাকরীর শুরু করে দেন। এতে করে মূল মাকসাদ হারিয়ে হাওয়ায়ী তাকরীর (বায়বীয় বক্তৃতা) ছাত্রদের মাথা চেপে ধরে।

প্রাথমিক জামা'আতগুলোতে তামরীন ও অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করজোর করে নিবেদন করছি, বিশেষ করে প্রাথমিক জামা'আতের আসাতিযায়ে কেরামের খেদমতে আরয করছি, আপনারা ইজরা ও তামরীনের প্রতি যথাসাধ্য জোর দিবেন। অহেতুক আলোচনা ত্যাগ করে কিতাব ও ইবারত হল্ল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করবেন। আমি ফের আপনাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দরখাস্ত করছি, আল্লাহর ওয়াস্তে ছাত্রদেরকে অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনার দিকে নিয়ে যাবেন না। তাদেরকে বরং কিতাবের ইবারত বোঝার মতো যোগ্য বানিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ তারা আপনার জন্য সদকায়ে জারিয়া হবে।

সর্বশেষ নিবেদন

ছাত্রদের ইজ্জতের প্রতি লক্ষ্য রাখুন!

যে সকল ছাত্র আমাদের কাছে এসেছেন, চাই যে কোনো বিভাগেরই হোক, সবাই ইলমে দীনের মেহমান। যদি আমরা তাদেরকে ইজ্জত না করি তাহলে অন্য লোকেরা কিভাবে করবে? সুতরাং ছাত্রদের প্রতি স্নেহের সাথেসাথে তাদের ইজ্জতের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করবেন। এমন কোন আচরণ করবেন না যাতে তাদের অসম্মান হয়। একথা এজন্য বলছি যে, কখনো উস্তাদরা ছাত্রদের সাথে বে-তাকাল্লুফীর সীমা ছাড়িয়ে যান। এটা কিছুতেই উচিৎ নয়। যেমন উস্তাদ যদি ছাত্রদেরকে এভাবে বলেন যে– 'অ্যাই ব্যাটা! তুই এটা কী করিস? অ্যাই ব্যাটা! এমন করিস ক্যান? অ্যাই ব্যাটা! এখানে বস' এ ধরণের কথাবার্তা যদিও তিনি বেলা-তাকাল্লুফ বলেন কিন্তু এর একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া ছাত্রদের উপর পড়ে। আমাদের কাজ তো তাদেরকে তরবিয়ত প্রদান করা, তাদেরকে সম্বোধনের পদ্ধতি শেখানো যে, তুমি যদি তোমার শত্রুর সঙ্গেও কথা বল তখনও তোমাকে আদবের সাথে, নম্রতার সাথে তাকে সম্মান জানিয়ে কথা বলতে হবে। অনুরূপভাবে কারো তানকীদ (সমালোচনা) করলে তা-ও ভদ্রতার সাথে করতে হবে। প্রথমদিন থেকেই ছাত্রদেরকে আমাদের এই সবক শেখাতে হবে। আবারো বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কাজ করবেন না। তাদেরকে ইজ্জত করুন, ইজ্জত করা শেখান। তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। তাদের সাথে সম্মান ও মহব্বতের আচরণ করুন। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, তরবিয়তের জন্য কখনো ধমক দিতে হয়, শাস্তি দিতে হয়, তা দিবেন, কিন্তু পরিশীলিত ও মার্জিত পন্থায় করবেন। এটাই আমার সর্বশেষ নিবেদন, দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন!

কয়েকটি বিষয় মুযাকারার নিয়তে আপনাদের খেদমতে আরয করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকেসহ সবাইকে আমলের তাওফীক দান করেন। আমীন!

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ উমর ফারুক ইবরাহীমী

জামি'আ ইবনে মাসউদ রাযি.
সারপরস্ত: শাইখুল হাদীস হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.
বাড়ী#১২, রোড#০২, ব্লক#ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ভর্তি চলছে সকল বিভাগে

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী; মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
- মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এর নেগরানীতে ফাতাওয়ার তামরীন।
- জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার আসাতিযায়ে কেরামের দরস প্রদান।
- তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়ার সমন্বয়ে সুযোগ্য ওয়ারাসায়ে আম্বিয়া গঠন।
- দ্বীনের চতুর্মুখী তাক্বাযা পূরণ।
- মুহাক্কিক ও মুত্তাকী আলেমেদ্বীন তৈরী করা।
- সার্বক্ষণিক নেগরানীর বিশেষ ইন্তেযাম।
- সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।

বিভাগসমূহ
- তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্বহি ওয়াল ইফতা (২ বছরের কোর্স)
- কিতাব বিভাগ (নাহবেমীর পর্যন্ত)
- হিফয বিভাগ
- নাযেরা বিভাগ
- মক্‌তব বিভাগ

আগ্রহী শিক্ষার্থীকে ভর্তি হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে

সার্বিক যোগাযোগ
মুফতী মুজাহিদুর রহমান (মুহতামিম) মোবাইল: ০১৯১১৩৫৩২৮১, অফিস: ০১৩১১১৫৩৩৫৭, ০১৬৭১৬৫২৫৮৬
যাতায়াত: মুহাম্মদপুর বেড়ীবাঁধ চৌরাস্তা থেকে ৪০ ফুট রাস্তা– সেখান থেকে ১ কিলো পশ্চিমে ডি.এম ভবন। ভবন থেকে সামান্য উত্তরে (মাহাদুল বুহুস আল ইসলামিয়া) সংলগ্ন।

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

(ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ	কার্যক্রম
৭ শাওয়াল	মাদরাসা খোলা, সকল জামাআতের ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের ভর্তিফরম সংগ্রহ, তাইসীর থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (মৌখিক) ও ভর্তি।
৮ শাওয়াল	হিদায়াতুন্নাহব থেকে তাখাস্‌সুস পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক)।
৯ শাওয়াল	ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি (পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ঐ দিন ভর্তি হওয়া লাযেম, পরে সুযোগ থাকবে না)।
১০ শাওয়াল	মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা ও ভর্তি।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও শর্তাবলী

১. ১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু নতুন/পুরাতন সকল ছাত্রের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজ ২কপি ছবি লাগবে। ২. নতুন ছাত্রদের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটি প্রশ্নের উত্তর উর্দূতে দিতে হবে।

পরীক্ষার বিষয়

ক্র.	জামা'আত	বিষয়
০১	তাফসীরুল কুরআন বিভাগ	জালালাইন, আল-ফাউযুল কাবীর
০২	উলূমুল হাদীস বিভাগ	সহীহ বুখারী ১ম, শরহু নুখবাতিল ফিকার
০৩	ইফতা বিভাগ	সহীহ বুখারী ১ম, হিদায়া ৩য়, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৪	দাওয়াহ বিভাগ	সহীহ মুসলিম (কিতাবুল ঈমান), আহকামুল কুরআন লিল-জাস্‌সাস ১ম এবং বাংলা, উর্দূ ও আরবীতে সংক্ষিপ্ত রচনা
০৫	আদব বিভাগ	আরবী কাওয়াইদ, ইবারত পাঠ, লেখালেখি ও অনুবাদের যোগ্যতা ও আধুনিক আরবীর সাথে সম্পৃক্তি
০৬	তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস)	মিশকাত, হিদায়া ৪র্থ
০৭	নিহায়ী সানী (মিশকাত)	জালালাইন (পূর্ণ), হিদায়া ১ম ও ২য়
০৮	নিহায়ী আউয়াল (জালালাইন)	শরহেবেকায়া (পূর্ণ), নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৯	সানাবী সানী (শরহেবেকায়া)	শরহেজামী, কানযুদ্দাকাইক
১০	সানাবী আউয়াল (শরহেজামী)	কাফিয়া, কুদূরী
১১	উস্তানী সালিস (কাফিয়া)	হিদায়াতুন্নাহব, ইলমুস সীগাহ
১২	উস্তানী সানী (হিদায়াতুন্নাহু)	নাহবেমীর, ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগাঞ্জ
১৩	উস্তানী আউয়াল (নাহবেমীর)	মীযান মুনশাইব/ইলমুস সরফ ১ম ও ২য়, আরবী আদব
১৪	ইবতিদায়ী সানী (মীযান)	তাইসীর, ফারসী কী পেহলী কিতাব
১৫	ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর)	উর্দূ কায়িদা, নাযিরা (গাইরে হাফেযদের জন্য)

বি.দ্র. উল্লিখিত জামা'আতগুলোর লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মতনখানীর পরীক্ষা হবে।

আত-তাখাস্‌সুস ফিল-ফিক্‌হি ওয়াল-ইফতা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

১. আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি ফরম ২৪ রমাযান ১৪৪২ হিজরীর আগেই সংগ্রহ করতে হবে।

২. শুধুমাত্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা'র ফাযেলগণ ফরম সংগ্রহ করবেন।

৩. দাওরায়ে হাদীস/তাকমীল জামা'আতে ২য় সাময়িক পরীক্ষার গড় নম্বর মুমতায থাকতে হবে এবং নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দফতর কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৪. লিখিত ও মৌখিক দুই পর্বে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা ২৫ রমাযান বাদ যোহর ও মৌখিক পরীক্ষা ২৬ রমাযান বাদ যোহর নেয়া হবে। মৌখিক পরীক্ষায় সুযোগ প্রাপ্তদের তালিকা ২৬ রমাযান সকাল ১১টায় প্রকাশ করা হবে।

৫. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, হিদায়া ৩য় খণ্ড, নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কিছু জরুরী পরীক্ষা নেয়া হবে।

৬. লিখিত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষার সুযোগ পাবে এবং উভয় পরীক্ষায় গড়ে ন্যূনতম ৬৫ নম্বরে উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম ১৫ জন ভর্তির সুযোগ পাবেন।

৭. ২৭ রমাযান সকাল ১১টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং রমাযানের মধ্যেই ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাবে।

–শিক্ষা দফতর, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

সন্তানকে সম্পদরূপে গড়ে তুলুন!

আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী দা.বা.

সন্তান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নেয়ামত ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত। নিঃসন্তান দম্পতি বুঝতে পারে সন্তানের মর্ম, আর কুসন্তানের পিতামাতা বুঝতে পারে সন্তানের যাতনা! পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যাকে দান করেছেন সুসন্তান– চাই তা পুত্র হোক বা কন্যা– সে-তো দুনিয়ায় বাস করেও অনুভব করে জান্নাতের সুখ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(অর্থ:) সম্পদ ও সন্তানাদি তো পার্থিব জীবনের শোভা! (সূরা কাহফ, আয়াত-৪৬)

এজন্য পিতা-মাতার উচিৎ সন্তান নামক এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং সন্তানকে দুনিয়ার নয়নপ্রীতি এবং আখেরাতের পুঁজিরূপে গড়ে তোলা। হাদীসে এসেছে–

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(অর্থ:) মানুষ যখন ইন্তেকাল করে, তার নেক আমলের ধারাগুলো বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি ধারা সচল থাকে– (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) উপকারী ইলম, (৩) পিতামাতার জন্য দু'আকারী সুসন্তান। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৩১০)

সন্তান তার পিতামাতার জন্য কিভাবে দু'আ করবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে তা-ও শিখিয়ে দিয়েছেন–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

(অর্থ:) হে আমার রব্ব! আপনি আমার পিতামাতার প্রতি তেমন সদয় আচরণ করুন, যেমন (সদয় আচরণের সঙ্গে) তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৪)

দু'আটির শব্দগুলো লক্ষ্য করুন! এখানে সন্তান নিজ পিতামাতার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তেমন সদয় আচরণের আবেদন জানাচ্ছে, যেমন সদয় আচরণ তারা শৈশবে পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিল। প্রশ্ন জাগে, যে পিতামাতা সন্তানের শৈশবে তার সঙ্গে দয়ার আচরণ করেনি অর্থাৎ সন্তানের অধিকার ও পাওনাগুলো যথাযথ আদায় করেনি, সন্তানকে সুসন্তানরূপে গড়ে তোলেনি, সন্তানের এই শর্তযুক্ত দু'আটি কি তাদের পক্ষেও কবুল হবে? কবুল না হওয়ার কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে! এজন্য পিতামাতার উচিৎ সন্তানের কাছ থেকে নিজেদের হক ও পাওনাগুলো আশা করার আগে সন্তানের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও করণীয়গুলো পালন করা। এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযি.-এর এই ঘটনাটি স্মরণ রাখা যেতে পারে–

একবার একব্যক্তি হযরত উমর রাযি.-এর নিকট নিজ পুত্রের অবাধ্যতার অভিযোগ করল। হযরত উমর রাযি. ছেলেটিকে ডেকে আনলেন এবং পিতার অবাধ্যতার কারণে তাকে খুব শাসালেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যেতে বললেন। একপর্যায়ে ছেলেটি বলল, আমীরুল মুমিনীন! পিতার কাছে কি সন্তানের কোন পাওনা নেই? হযরত উমর রাযি. বললেন, কেন থাকবে না, অবশ্যই আছে। ছেলেটি বলল, সেই হক ও অধিকারগুলো কী? তিনি বললেন, (১) সুসন্তান লাভের আশায় উপযুক্ত মা বাছাই করা। (২) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা। (৩) আল্লাহর কিতাব কুরআন শিক্ষা দেয়া। ছেলেটি বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমার পিতা আমার জন্য এগুলোর কোনটিই করেননি– আপনিই দেখুন, আমার মা একজন অগ্নিপূজারী হাবশী দাসী। আমার নাম রাখা হয়েছে জু'আল (গুবরে পোকা) এবং তিনি আমাকে আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষরও শিক্ষা দেননি। ছেলেটির একথা শুনে হযরত উমর রাযি. পিতার দিকে ঘুরে গেলেন এবং তাকে বললেন, তুমি ছেলের অবাধ্যতার অভিযোগ নিয়ে এসেছো অথচ তুমিই আগে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছো এবং তুমিই আগে তার সঙ্গে অসদাচরণ করেছো; ভাগো এখান থেকে! (মাউসূআতুদ দিফা'অ আন রাসূলিল্লাহ ৪/১৪৮)

হযরত উমর রাযি.-এর এই ধমক বর্তমানকালের পিতামাতার জন্য আরও বেশি প্রাসঙ্গিক এবং এতে রয়েছে তাদের জন্য দায়িত্বশীল আচরণের কঠোর নির্দেশনা। এখন পিতামাতার নিকট সন্তানের প্রাপ্য ও অধিকারগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হচ্ছে–

(১) সুসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় নেককার স্ত্রী/স্বামী গ্রহণ। এজন্য বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী/স্বামীর দীনদারী ও সচ্চরিত্রকে প্রাধান্য দেয়া। সম্পদ, সৌন্দর্য ও বংশমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে দোষ নেই; তবে দীনদারী ছাড়া এগুলোর কোনও মূল্য নেই।

(২) নেকসন্তান লাভের জন্য দু'আ অব্যাহত রাখা। এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে বিশেষ দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(অর্থ:) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করুন এমন জুটি ও এমন সন্তান যারা হবে আমাদের চোখের শীতলতা। আর আমাদেরকে খোদাভীরুদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান-৭৪)

(৩) সন্তানের জন্য দীনী পরিবেশ প্রস্তুত করা। এর ব্যাখ্যা হলো– অনাগত সন্তানের নেক হওয়ার আশায় মাতা-পিতার আমল-আখলাকে পরিবর্তন নিয়ে আসা। নামায-কালামে অভ্যস্ত না হলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। কোন গোনাহে অভ্যস্ত থাকলে অনাগত সন্তানের খাতিরে পরিত্যাগ করা। অসভ্য ও অভদ্র আচরণ পরিহার করে সভ্য ও ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত হওয়া। বাসা-বাড়িতে গোনাহের সামানা যথা টেলিভিশন ইত্যাদি থাকলে সেগুলো বের করে দেয়া। দুনিয়ার সামান্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কতো অভ্যাস ত্যাগ করে, সেখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ সন্তানের খাতিরে পিতা-মাতা কি এটুকু করতে পারবে না? হাদীসে এসেছে–

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

(অর্থ:) প্রতিটি নবজাতক ইসলামী ফিতরাত (স্বভাব) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, অথবা খ্রিস্টান বানায়, অথবা অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৮৫)

অর্থাৎ পিতা-মাতার সৎ-স্বভাব সন্তানের জন্মগত সৎ-স্বভাবকে বহাল রাখে আর তাদের মন্দ স্বভাব সন্তানকে মন্দ বানিয়ে দেয়।

(৪) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার ডান কানে আযান দেয়া এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া। অর্থাৎ শিশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে আযান ও ইকামাতের বাক্যগুলো তাকে শুনিয়ে দেয়া। আযান শোনানোর এই কাজটি পুরুষ-মহিলা সবাই করতে পারে।

(৫) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনন্দে আল্লাহর শোকর আদায় করা; শিরকে লিপ্ত না হওয়া। অনুরূপ অন্য কারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পেলে তাকে নিম্নোক্ত দু'আ দ্বারা মুবারকবাদ জানানো এবং নিজেও দু'আটির মর্ম হৃদয়ে ধারণ করা।

بارَكَ اللّٰه لكَ فِي الموهوب لك، وشكرتَ الواهبَ، وبلغَ أشدَّه ورُزقت برّه

(অর্থ:) আল্লাহ আপনাকে তার দানকৃত জিনিসে (নবজাতক সন্তানে) বরকত দান করুন। আপনাকে সুমহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার তাওফীক দিন। শিশুটিকে পরিণত বয়সে উপনীত করুন (অর্থাৎ দীর্ঘ হায়াত দিন।) এবং আপনাকে তার সদাচরণ নসীব করুন।

(৬) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে এই কাজগুলো করা– সন্তানের সুন্দর নাম রাখা। চুল মুণ্ডানো। মুণ্ডানো চুলের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা কিংবা তার মূল্য সদকা করা। সামর্থ্য থাকলে আকীকা করা।

(৭) তাহনীক করা। অর্থাৎ সন্তান বড় হয়ে নেককার হবে এই আশায় শিশুর প্রথম খাদ্য হিসেবে কোন নেককার ব্যক্তির খুরমা বা খেজুর চিবানো রস শিশুর জিহ্বার তালুতে রেখে দেয়া।

(৮) সন্তানকে আদর-স্নেহ করা। আদর-স্নেহের ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা সকল সন্তানের মাঝে সমতা বজায় রাখা। অনুরূপভাবে উপহার বা দান-অনুদানের ক্ষেত্রে সকল সন্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখা। কোন সন্তানের প্রতি আদর-স্নেহ ও দান-অনুদানের ব্যাপারে পিতামাতার অন্যায্য পক্ষপাতিত্ব অন্য সন্তানকে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার উস্কানি দেয়।

(৯) কুদরতী কোন অপারগতা দেখা না দিলে সন্তানকে অবশ্যই পূর্ণ দুই বৎসর দুধ পান করানো।

(১০) নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সন্তানের বৈধ ও উপযোগী প্রয়োজন পুরা করা।

(১১) সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। এর ব্যাখ্যা হলো– সন্তানকে খাঁটি মুসলিমরূপে গড়ে তোলা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দা এবং নবীজীর আদর্শ উম্মত হিসেবে গড়ে তোলা। এর দ্বারা সন্তানের আখেরাত নিরাপদ হবে এবং দুনিয়াও আবাদ হবে। আজ পিতা-মাতারা কেবল সন্তানের দুনিয়া আবাদের ফিকির করছেন। ফলে সন্তানের আখেরাত তো বরবাদ হচ্ছেই, পিতা-মাতার আখেরাতও বরবাদ হচ্ছে। এমনকি বস্তুবাদী পিতা-মাতার বস্তুবাদী সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেও তাদের কাজে আসছে না। বয়স্ক পিতামাতাকে সন্তানেরা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে। এই তিক্ত মাকাল ফল পিতামাতার অনিবার্য প্রাপ্য। কারণ তারা তো মাকাল গাছই রোপণ করেছেন। সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার দু'টি ধাপ রয়েছে–

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগ পর্যন্ত পিতা-মাতা সন্তানকে যে শিক্ষা প্রদান করেন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে সেটা বোঝানো হচ্ছে। এর সময়সীমা দুধপানের বয়স থেকে সাত বছর পর্যন্ত। এ সময়টিতে সন্তান তার পিতামাতা ও পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা লাভ করে সেটা তার সারা জীবনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হয়ে থাকে। এজন্য পিতামাতা এ সময়টিতে পরিকল্পিতভাবে সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করবেন। এই শিক্ষাদানের পুরো প্রক্রিয়া আদেশ-নিষেধ বর্জিত হলে ভালো হয়। অর্থাৎ সন্তানকে আদেশ-নিষেধ করার পরিবর্তে পিতা-মাতা নিজেরাই ইসলামী সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উপর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবেন। ফলে সন্তান তাদেরকে দেখে দেখে আগ্রহের সঙ্গে সেগুলো শিখতে থাকবে। এক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতাকে বেশি ভূমিকা রাখতে হয়। কেননা মায়ের কোল শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। এই শিক্ষার নিয়ম-পদ্ধতির সারসংক্ষেপ হলো–

এক. শিশু সন্তানকে আল্লাহর নাম, নবীজীর নাম ও কুরআনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবে। এর পদ্ধতি হলো–

মা যখন তার কলিজার টুকরোকে দুধ পান করাবে বা কোন খাবার খাওয়াবে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে। খাওয়ানো ও পান করানো শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। ঘুম পাড়ানোর সময় আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে বলে দোল খাওয়াবে। বিস্ময়কর কিছু ঘটলে বা দেখলে সুবহানাল্লাহ বলবে। পছন্দনীয় কিছু ঘটলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। অঘটন বা আপদ-বিপদ ঘটলে ইন্নালিল্লাহ বলবে। শিশুকে কোন কিছু দেয়ার ওয়াদা করলে ইনশাআল্লাহ বলবে। এভাবে মায়ের মুখ থেকে আল্লাহ শব্দযুক্ত বাক্যগুলো শুনতে শুনতে একসময় শিশুর মনে অবচেনতভাবেই আল্লাহর নাম খচিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সন্তানের মুখে যখন কথা ফুটবে, তার সামনে কুরআনের যতটুকু মুখস্থ আছে মাঝে-মধ্যে পড়তে থাকবে।

দুই. সন্তান যখন একটু একটু বুঝতে শিখবে তাকে ইসলামী আদব ও শিষ্টাচার শেখাবে। এর নিয়ম হলো–

(ক) সবাইকে সালাম দেয়া শিখাবে। পিতা-মাতা নিজেরাই সন্তানদেরকে সালাম দিতে থাকবে। পিতা ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, অনুরূপভাবে ঘরে প্রবেশ করে বিশেষভাবে সন্তানকে সালাম দিবে।

(খ) সকল ভালো কাজে ও ভালো স্থানে ডানকে প্রাধান্য দিবে। উদাহরণত সন্তানকে পোশাক পরানোর সময় ডান হাত ও ডান পায়ে আগে পরাবে। খানা খাওয়ার সময় ডান হাতে খাওয়া শিখাবে। কারও কাছে থেকে কিছু নিতে হলে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়ার অভ্যাস করাবে।

(গ) সকল নিম্নমানের কাজে ও নিম্নমানের স্থানে বামকে প্রাধান্য দিবে। উদাহরণত পোশাক খোলার সময় বাম হাত ও বাম পা থেকে আগে খুলবে। নাক ঝাড়ার সময় বাম হাতে ঝাড়া শেখাবে।

(ঘ) সকল কাজের সুন্নত তরীকা শিখাবে। অর্থাৎ তাদের সামনে খানা-পিনা, ঘুমানোসহ সকল কাজ সুন্নাত তরীকায় করবে। এর ফলে তারাও এই নিয়মে কাজগুলো করতে শিখবে।

(ঙ) বিভিন্ন কাজে যে সকল দু'আ আছে, মাতা-পিতা সেগুলো উচ্চস্বরে পড়ে কাজ করা শুরু করবে কিংবা শেষ করবে। এভাবে শুনতে শুনতে শিশুরও বিভিন্ন দু'আ-কালাম মুখস্থ হয়ে যাবে।

(চ) বড়দেরকে সম্মান করা শিখাবে। সন্তানের দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-মামা, ফুফু-খালাদের সঙ্গে সন্তানের পিতা-মাতা যদি সদয় আচরণ করেন, তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলেন এর দ্বারা সন্তানও তাদেরকে সম্মান করা শিখবে এবং নিজের পিতামাতার সঙ্গেও সদাচরণ করবে।

(ছ) সন্তানকে লজ্জা-শরম শিখাবে। অবুঝ মনে করে সন্তানের সামনে লজ্জা-শরমের বিষয়াদিতে কখনও অসতর্ক হবে না। পারতপক্ষে এক শিশুর সামনে অপর শিশুরও সতর খুলে রাখবে না। সন্তানের সামনে অশ্লীল কথা ও অশ্লীল আচরণ করবে না। বড়দের অসতর্ক আচরণ শিশুকে অহেতুক কৌতূহলী করে তোলে

এবং অনেক সময় বড়দের নির্লজ্জ কথা ও আচরণ শিশুর সারাজীবন মনে থাকে।

(জ) সন্তানকে সত্য-মিথ্যা চিনিয়ে দিবে। ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দিবে। শিশুর সামনে কখনই মিথ্যা বলবে না, মিথ্যা ওয়াদা করবে না।

(ঝ) সবর ও ধৈর্য শিখাবে। অপরকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা গড়ে দিবে। অপরকে দান করা শিখাবে। এজন্য শিশুর উপস্থিতিতে কাউকে দান করতে হলে যথাসম্ভব তার হাত দিয়ে করাবে।

(ঞ) সন্তানকে খরচে মধ্যপন্থা শিখাবে। অর্থাৎ পিতামাতার সামর্থ্য থাকলেও সন্তানের সকল বৈধ আবদার পুরা করবে না। বরং কখনও কখনও তার আবদার পুরা না করে শিক্ষা দিবে যে, সামর্থ্য থাকলেও প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সব আকাঙ্ক্ষা পুরো করতে নেই।

(ট) শিশুর ভালো কাজে উৎসাহ দিবে। সাধ্য অনুযায়ী পুরস্কৃত করবে। 'তুমি তো কিছুই পারো না, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না' এ জাতীয় কথা শিশুকে হীনমন্য বানিয়ে দেয়।

(ঠ) সন্তানের বয়স ৩/৪ হলে তাকে কুরআনের হরফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবে। তাকে সামনে বসিয়ে ভালো ভালো বই পড়ে শোনাবে। নবীদের জীবনী, সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী, নেককার বান্দাদের কিসসা ইত্যাদি শোনাবে।

(ড) শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তার মতামত যতোই হাস্যকর হোক প্রথমে বাহবা দিয়ে, প্রশংসা করে তারপর সঠিক বিষয়টা বুঝিয়ে দিবে।

(ঢ) শিশুকে আস্তে-ধীরে অল্প-অল্প করে নিজের কাজ নিজে করা শেখাবে। তাকে দিয়ে তার সাধ্য অনুযায়ী টুকটাক কাজ করাবে। মাঝে-মধ্যে কিছু কাজ তাকে নিজের মতো করে আনতে বলবে। অতঃপর তার কাজের প্রশংসা করে স্নেহের সাথে ভুলটুকু ধরিয়ে দিবে। অনুরূপভাবে খাদ্যগ্রহণ, পেশাব-পায়খানার পর পরিচ্ছন্ন হওয়ার নিয়ম শেখাবে।

(ণ) সন্তানের সামনে নিজেরা ঝগড়া-ঝাটি করবে না, গালাগালি করবে না। কারণ শিশুরা বড়দের এসব অসভ্য আচরণ খুব সহজেই শিখে নেয়।

(ত) শিশুর সঙ্গে কোমল আচরণ করবে, রূঢ় আচরণ করবে না। শিশুরা অন্যায় কিছু করে ফেললে হালকা তিরস্কার তো করবে কিন্তু গালি দিবে না। কঠোর ও রূঢ় আচরণ শিশুকে দয়ামায়াহীন বানিয়ে দেয়।

(থ) বাসার কাজের সহযোগী কিংবা অন্য কোন শিশুর সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে প্রশ্রয় দিবে না। বুঝিয়ে শুনিয়ে যার সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছে তার কাছে নিয়ে গিয়ে মাফ চাওয়াবে। অনুরূপভাবে অন্যকে মাফ করে দেয়াও শিখাবে। অন্য কোন শিশু আমার সন্তানের উপর যুলুম করলে এর প্রতিকার হিসেবে নিজ শিশুর সামনে ঐ শিশুকে ধমকাবে না। বরং যা বলার ঐ শিশুর অভিভাবককে গিয়ে বলবে এবং এ সময় নিজের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না।

(দ) সন্তান কোন জিনিস নষ্ট করে ফেললে তাকে অত্যধিক তিরস্কার না করে সেটা মেরামত করা শেখাবে। এতে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

(ধ) সন্তানের চারিত্রিক ত্রুটির ব্যাপারে বিলকুল প্রশ্রয় দিবে না। উদাহরণত কারও বাসা থেকে না বলে কোন জিনিস নিয়ে আসল। কারও গাছ থেকে ফল-ফুল না বলে ছিঁড়ে আনল। তো এর জন্য তাকে প্রয়োজনে হালকা শাস্তি দিবে, যাতে সারাজীবন সে আর এ ধরণের কাজের সাহস না পায়। পক্ষান্তরে 'বাচ্চা মানুষ, একটা ফুলই তো এনেছে!' এ জাতীয় প্রশ্রয় একসময় তাকে দাগী অপরাধী বানিয়ে দেয়।

(ন) সন্তানের অহেতুক জিদকে প্রশ্রয় দিবে না। উদাহরণস্বরূপ ছেলে-মেয়ে মোবাইল কিনে দেয়ার জন্য জিদ ধরল, অথচ এই বয়সে তার জন্য মোবাইলের মালিক হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। ব্যস, যতো আবদারই করুক, কিছুতেই তা পূরণ করবে না। সম্ভব হলে সন্তান বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজেরাও স্মার্টফোন ব্যবহার করবে না। অপারগতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সন্তানকে এড়িয়ে ব্যবহার করবে।

(প) মাতা-পিতার কোন একজন সন্তানকে শাসন করলে সাথেসাথেই আরেকজন আদর করা শুরু করবে না; একটু সময় নিয়ে শাসন হজম করার পর আদর করবে।

(ফ) সব শিশুর মেধাবিকাশের সময় ও পদ্ধতি একরকম নয়। এজন্য সমবয়স্ক অপর শিশুর ভালো আচরণ বা ভালো ফলাফলের অতি প্রশংসা করে নিজের সন্তানকে হীনমন্য বানাবে না।

(ব) শিশুর বয়স সাত বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কিছু শেখানোর জন্য মৌখিকভাবেও অতিকড়া শাসন করবে না; প্রহারের তো প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, কিছুটা সতর্ক করা যেতে পারে, তবে এতোটা নয় যে এই বিষয় মাথায় নিয়েই সে দীর্ঘক্ষণ বিষণ্ন থাকে। এতে শিশুর শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সে ভীতু হয়ে বেড়ে ওঠে।

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলে দেয় হলো। সচেতন পিতা-মাতা চিন্তা–ভাবনা করলে আরও বহু বিষয় তাদের উপলব্ধি হবে। সে অনুযায়ী তারা নিজ সন্তানের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করবেন।

(ভ) সন্তানের বয়স সাত বছর হয়ে গেলে তাকে নামাযের আদেশ করবে। তার বিছানা নিজেদের বিছানা থেকে পৃথক করে দিবে। পারতপক্ষে দুই ভাই বোনকেও আলাদা আলাদা বিছানায় শোয়ানোর ব্যবস্থা করবে। অপারগতার ক্ষেত্রে দু'জনের জন্য আলাদা আলাদা চাদর ও আলাদা আলাদা কাঁথা-কম্বলের ব্যবস্থা করবে।

(ভ) শিশুকে কখনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিবে না। হাদীসে পাকে এই কাজকে গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা:

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দু'টি ধারা রয়েছে। (ক) খালেছ দীনী শিক্ষা, যা দীনী প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসায় প্রদান করা হয়। (খ) সাধারণ শিক্ষা, যা স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে প্রদান করা হয়। হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সূচনা করার বয়স সাত বছর। (এর পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব ঘরে বা ঘরোয়া পরিবেশে সম্পন্ন করাবে।) এ সময় পিতামাতাকে সর্বাগ্রে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সন্তানকে তারা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন; সম্পূর্ণরূপে দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিবেন, নাকি দীনদারীর সাথে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। বাস্তবতা হলো সীমিত সংখ্যক সাহসী ব্যক্তি এবং সীমিত সংখ্যক অপারগ লোক ছাড়া বেশিরভাগ পিতা-মাতাই সন্তানকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আগ্রহ রাখেন। তারা সন্তানের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকটি লক্ষ্য করে এটা করে থাকেন। এটা উত্তম নির্বাচন না হলেও এতে দোষের কিছু নেই যদি তারা কলিজার টুকরো সন্তানকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি বাহ্যিকভাবে তার পরকালীন সাফল্যও নিশ্চিত করতে পারেন এবং তাকে জাহান্নামের মহাশাস্তি থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। যদিও বর্তমান পরিবেশে একই সঙ্গে দুনিয়া-আখেরাত উভয় দিক রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। চরম বাস্তব এ ব্যাপারটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে আল্লাহর বাণীতে–

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

(অর্থ:) বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ আখেরাত কতই না শ্রেয় ও স্থায়ী। (সূরা আ'লা-১৬,১৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইরশাদ করেছেন–

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

(অর্থ:) যে দুনিয়াকে ভালোবাসল সে আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করল আর যে আখেরাতকে ভালোবাসল সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করল, (অর্থাৎ দু'টো দিক সমতালে রক্ষা করা সম্ভব হয় না।) সুতরাং যা চিরস্থায়ী তাকে ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মোকাবেলায় প্রাধান্য দাও। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৯৬৯৮)

তা সত্ত্বেও কেউ যদি তার সন্তানকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান এবং ক্ষেত্রবিশেষ এর প্রয়োজনও থাকে তাহলে সাধারণ শিক্ষা শুরু করানোর আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ যত্নবান হবেন–

(ক) সন্তানকে বিশুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শেখানোর ব্যবস্থা করবেন এবং নিয়মিত তিলাওয়াত করছে কিনা খেয়াল রাখবেন।

(খ) শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান, সুন্নাত তরীকায় বিদ'আতমুক্ত ইবাদত, হারামমুক্ত উপার্জন ও লেনদেন, ইসলামী সামাজিকতা তথা অপরাপর মানুষ ও মাখলুকাতের অধিকার এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক আখলাক-চরিত্র এই পাঁচটি বিষয়ের ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। এই পাঁচটি বিষয় এবং বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শেখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম দুই/তিনটি বছর মানসম্মত কোন মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, মাদরাসাওয়ালাদের কর্তব্য হলো, এ ধরনের 'স্বল্পমেয়াদী' শিক্ষার্থীদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন সিলেবাসের ব্যবস্থা করা, যাতে ২/৩ বছরের মধ্যেমধ্যে শিক্ষার্থীরা 'ফরযে আইন' পরিমাণ দীনী ইলম হাসিল করতে পারে।

(গ) উল্লিখিত বিষয়গুলো শেখার পর সাধারণ শিক্ষা অর্জনের জন্য সন্তানকে এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবেন–

* যেখানকার শিক্ষকগণ ধর্মীয় চেতনা লালন করেন। ধর্মপালনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। নিজেরা নামায-কালাম পড়েন। শিক্ষার্থীদেরকেও নামায-কালামে উৎসাহ দেন। অনুরূপভাবে শিক্ষকগণ ধর্মীয় বিষয়ে কোনরূপ বিদ্বেষ রাখেন না।

* যেখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা নেই কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের জন্য ভিন্নভিন্ন সময় নির্ধারিত রয়েছে।

* যেখানে ছাত্রদের জন্য পুরুষ শিক্ষক আর ছাত্রীদের জন্য মহিলা শিক্ষিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হলেও দুঃসাধ্য নয়। মনে রাখতে হবে, যে আগুন ঘর পুড়িয়ে দেয় তা বয়ে আনার চেয়ে অন্ধকার ঘরে থাকা কোটিগুণে উত্তম।

(ঘ) সন্তানের নিয়ত এবং নিজেদের নিয়ত বিশুদ্ধ রাখবেন। অর্থাৎ সন্তান যেন শিক্ষাকে নিছক রুটি-রুজির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে বরং খিদমতে খালক তথা সৃষ্টিসেবার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে– এটা সন্তানের অন্তরে বসিয়ে দিবেন এবং নিজেদের অন্তরেও লালন করবেন।

(ঙ) সন্তানকে নিয়ম করে নেককার বুযুর্গদের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন। আলেম-ওলামাদের মজলিসে বসিয়ে দিবেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এবং পরামর্শ করে চালাবেন ও চলতে বলবেন। নিজে সঙ্গে করে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যুক্ত করে দিবেন।

(চ) সন্তানের উপর অতি সুধারণা পোষণ করবেন না। বরং সন্তানের অজ্ঞাতে নিয়মিত তার উপর নজর রাখবেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে মহব্বতের সঙ্গে বুঝিয়ে/শাসন করে সংশোধন করে দিবেন। বলুন তো, পরিবেশ-প্রতিবেশ যদি চোর-ডাকাতের হয় তাহলে হীরা-জহরতের মালিক কি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে?

যে পিতা-মাতা সন্তানকে খালেছ দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান তাদের করণীয়:

(ক) নিয়ত বিশুদ্ধ করে নেয়া: এর ব্যাখ্যা হলো, দীনী শিক্ষাকে মনেপ্রাণে শ্রেষ্ঠ মনে করে, দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণকে নিজের দায়িত্ব মনে করে আল্লাহ ও তার রাসূলকে রাজি-খুশি করার জন্য সন্তানকে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করুন। সন্তানের দুনিয়াবী রুটি-রুজির ফিকির আল্লাহ পাকের যিম্মায় ছেড়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে কাফের-কুকুর কাউকেই না খাইয়ে রাখেন না; তাহলে তার দীনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়া ব্যক্তিকে কিভাবে না খাইয়ে রাখবেন?! অনেক সময় সম্পদশালী পিতামাতা মনে করে, আল্লাহ তো আমাদেরকে যথেষ্ট দিয়েছেন, কাজেই সন্তানকে দীনের জন্য বিলিয়ে দিয়ে অসুবিধা নেই। কারণ আমাদের যা-কিছু আছে সন্তান কোন কাজ-কারবার না করলেও তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটাও ভুল নিয়ত। এর দ্বারা দীনী শিক্ষার মর্যাদা প্রকাশ পায় না; বরং প্রকারান্তরে নিজেদেরকে সন্তানের রিযিকদাতা দাবী করা হয়। মোটকথা তালিবে ইলমের পিতামাতার নিয়তও বিশুদ্ধ রাখা জরুরী।

(খ) **সঠিক প্রতিষ্ঠান বাছাই:** প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পিতামাতারা সাধারণত শানদার বিল্ডিং, ভালো খানা-পিনা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে থাকেন, যাতে সন্তানের বাহ্যিক কোন কষ্ট না হয়। এটা নিষেধ করা হচ্ছে না; তবে এটা আনুষঙ্গিক বিষয়। আসল বিষয় হচ্ছে– প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান কী এবং তরবিয়ত তথা দীক্ষার মান কী– সর্বাগ্রে এটা লক্ষ্য করা। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দীনী বিষয়ে কতটুকু পারদর্শিতা অর্জন করছে, বিজ্ঞ আলেমদের কাছে তাদের মূল্যায়ন কী, শিক্ষার্থীদের আমল-আখলাক কতটুকু সন্তোষজনক, শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ মানবরূপে গড়ে তুলতে কতটুকু আন্তরিক, এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-কানুনের কতটুকু পাবন্দী করা হয়– সন্তানকে ভর্তি করার আগেই এগুলো ভালোভাবে যাচাই করা। প্রয়োজনে পরিচিত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সহায়তা নেয়া।

(গ) নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা: সন্তানকে ভালো কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; নিয়মিত খোঁজ-খবরও রাখতে হয়। এই খোঁজ-খবর শুধু সন্তানের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে নয়, তার পড়াশোনা ও আমল-আখলাকের ব্যাপারেও নিতে হয় বরং এ ব্যাপারে আরও বেশি করে নিতে হয়। অনুরূপভাবে শুধু সন্তানের কাছ থেকে নয়, তার শিক্ষকদের কাছ থেকেও তথ্য নিতে হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে হয়। সমস্যা দেখা দিলে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হয়।

(ঘ) **তালিবে ইলম ও আলেম সন্তানকে মূল্যায়ন করা:** এই মূল্যায়ন কয়েকভাবে হতে পারে। **এক.** সন্তানের সঙ্গেসঙ্গে নিজেরাও দীনের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া। এতোদিন নামায না পড়লে নামাযে অভ্যস্ত হওয়া। দাড়ি না রেখে থাকলে রেখে দেয়া। পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে গাফলতি থাকলে সচেতন হওয়া। মাদক সেবন কিংবা ধূমপানে অভ্যস্ত হলে ছেড়ে দেয়া। উপার্জনের মাধ্যম হারাম হলে

সংশোধন করে নেয়া। মোটকথা, সন্তান যেন তার শিক্ষার সঙ্গে পিতামাতার জীবনাচারে বৈপরিত্ব না দেখে এমনভাবে চলতে থাকা। **দুই.** সন্তানের ইলম দ্বারা নিজেরাও উপকৃত হওয়া। বস্তুত পিতামাতাই সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রথম হকদার। দুনিয়াবী ব্যাপারে কিন্তু এই ব্যাপারটি সকলেই বুঝে। অসুস্থ হলে সবার আগে ডাক্তার সন্তানের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। বাড়ি বানানোর আগে ইঞ্জিনিয়ার সন্তানের সঙ্গে পরামর্শ করে। মানুষের সামনে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার সন্তানকে নিয়ে গর্ব-গৌরব করে। অথচ অন্যান্য ব্যাপার তো দূরের কথা, নিছক মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারেও তালিবে ইলম বা আলেম সন্তানের কথায় পিতামাতা কর্ণপাত করে না, তার সঙ্গে পরামর্শ করার গরজ বোধ করে না। এভাবে পরিবারের কাছ থেকে অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে আলেম হওয়া সত্ত্বেও একসময় সন্তান অন্য সবার মতো বদদীনীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, নয়তো পরিবারের মধ্যে অবস্থান করেও বিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে থাকে কিংবা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এটা বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার এবং চরম এক বাস্তবতা। বলুন, নিজেই যদি নিজের সন্তানকে মূল্যায়ন না করি তাহলে সমাজ তাকে কেন মূল্যায়ন করবে? এজন্য পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে আলেম সন্তানের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা দরকার। অনুরূপভাবে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি সম্মান ফুটে উঠে এমন ভাষায় তাকে সম্বোধন করা। **তিন.** পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির দিনক্ষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তালিবে ইলম সন্তানের পড়াশোনার প্রতি খেয়াল রাখা। এমন না হয় যে, নিজেদের সুবিধামতো দিনক্ষণ নির্ধারণ করে সন্তানকে তার পড়াশোনা চলাকালীন অনুষ্ঠানে শরীক হতে বাধ্য করা হলো। এতে তার শিক্ষার প্রতি অবমূল্যায়ন করা হয়।

(ঙ) সন্তানকে অসৎ সঙ্গ হতে নিরাপদ রাখা। নিজেরা বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত না হওয়া। দীনী পরিবার নয় এমন আত্মীয়দের সঙ্গে শিক্ষাকালীন মিশতে না দেয়া। ঘরে বা বাসায় প্রাণী/নারীর ছবিযুক্ত এবং চরিত্র বিধ্বংসী লেখা সংবলিত পত্র-পত্রিকা না রাখা। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানদেরকে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন করে না রাখা। উপস্থিত হওয়া সমীচীন নয় এমন দাওয়াতে সন্তানকে নিয়ে না যাওয়া ইত্যাদি।

পিতামাতারা যদি নিজ নিজ সন্তানের ব্যাপারে উল্লিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলার চেষ্টা করেন, আশা করা যায় এই সন্তান সম্পদরূপে গড়ে উঠবে; দুনিয়াতে চোখের শীতলতা হবে, আখেরাতে নাজাতের উসিলা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

(অনুলিখন: মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম)

باسمه تعالى

دار العلوم معين الاسلام مدرسة - محمدبور - داكا

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা

বাড়ী # ১২০, রোড # ৪, স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা, বাংলাদেশ। মোবাইল ঃ ০১৯১৮-৯২০৭৮৮, ০১৭৯৯-৮৯৯৯৩২, ০১৯১১-৩৯১৮৬৫

Darul Uloom Muinul Islam Madrasa

House # 120, Road # 4, Shopnodara Hausing, Boshila Road, Mohammadpur
Dhaka, Bangladesh. Mobile : 01918-920788, 01799-899932, 01911-391865

সারপরস্ত

- **মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.**
  শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
- **মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযুর দা.বা.**
  স্বনামধন্য মুহতামিম, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
- **মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী হুযুর দা.বা.**
  স্বনামধন্য শাইখে সানী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

উপদেষ্টা

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসঊদ (মীযান) দা.বা.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.
নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

মাদরাসার বৈশিষ্ট্যসমূহ

* অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলির মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পাঠদান।
* তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়ার সমন্বয়ে সুযোগ্য ওয়ারাছায়ে আম্বিয়া গঠন।
* দ্বীনের চথুর্মুখী তাক্বাযা পূরণ।
* মুহাক্কিক ও মুত্তাকী আলেমে দ্বীন তৈরী করা।
* সার্বক্ষণিক বিশেষ নেগরানীর ইন্তেজাম।
* ত্বীব্বে নববী (সা.)-এর আলোকে খাদ্য ও পুষ্টি এবং শরীর চর্চা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দান।
* সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান।
* মাদরাসার ছুটিকালীন সময়ে হাতের লেখা,ভাষা ও সাহিত্য এবং গবেষণামূলক প্রশিক্ষণের সু-ব্যবস্থা।

বিভাগসমূহ

- তাফসীর বিভাগ
- তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা
- কিতাব বিভাগ
- হিফজ বিভাগ
- নাযেরা বিভাগ
- মক্তব বিভাগ
- নৈশ বিভাগ

ভর্তি চলছে

এতীম, অসহায় ও দরিদ্র ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা।

নিবেদক
মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসান
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা
০১৯১৮-৯২০৭৮৮, ০১৭৯৯-৮৯৯৯৩২

তাহযীবুল মাদারিসিল কওমিয়্যাহ বাংলাদেশ শিক্ষাবোর্ডের অন্তর্ভুক্ত

যাতায়াত: মোহাম্মদপুর বেরীবাঁধ চৌরাস্তা থেকে চল্লিশ ফুট রাস্তা, সেখান থেকে দক্ষিণে। বাড়ী # ১২০, রোড # ০৪, স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
(জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বের গলি আল আবরার টাওয়ার সংলগ্ন)

১৯৮৮ ঈসায়ীতে আহলে কাকরাইলের মজমায় প্রদত্ত

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

বয়ান লেখক: প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম দা.বা.

পটভূমি: *নিম্নলিখিত বয়ানটি দাওয়াত ও তাবলীগের তিনও হযরতজী রহ.-এর বিশেষ ও নিবিড় সোহবতপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. ১৯৮৮ ঈসায়ীর ২৫ মার্চ জুমাবার দিবাগত বাদ মাগরিব কাকরাইলের খানার কামরায় পেশ করেছিলেন। আহলে কাকরাইলের মজমায় প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বয়ানটি সন্ধ্যা ০৭:১৩ হতে রাত ০৮:২৯ পর্যন্ত সোয়া ঘণ্টা ধরে উর্দুতে (তরজমাবিহীন) করা হয়েছিল। কাকরাইলের অন্যতম মুরব্বী হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.-এর নির্দেশে আমি (বয়ান লেখক) তাৎক্ষণিকভাবে নিজস্ব শর্টহ্যান্ড কায়দায় এটি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। যেহেতু যে কোন মুযাকারা বা দাওয়াত দাঈর নিজের জন্য হয়, এজন্য আমি নিজের হিদায়াত ও ইসলাহের নিয়তে বয়ানটি রাবেতার পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা দয়ামায়া করে এটিকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এবং আমার, আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানাদি, পরিবার পরিজন, রাবেতার পাঠক ও তামাম উম্মতের পরিপূর্ণ মাগফিরাত ও হিদায়াতের যরিয়া বানিয়ে উভয় জগতে কামিয়াব করুন। আ-মীন।*

(এখন আমি একটি ব্যক্তিগত নেয়ামতের সংবাদ পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে তাদের আন্তরিক দু'আ কামনা করছি। প্রায় একচল্লিশ বছর আগের কথা। আমি তখন অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র। হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব রহ. ছিলেন কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী এবং বিশ্বইজতেমার বয়ানসমূহের প্রধান মুতারজিম। তিনি একবার কাকরাইল মসজিদে বাদ ফজর বয়ান করলেন। বয়ান শেষে আমি মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ৩ চিল্লা লাগানোর তাশকীল হলাম। সেই তাশকীলের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ হতে অনার্স মাস্টার্স সমাপন করে ১৯৮৪ সালে তাবলীগে ৩ চিল্লা লাগানোর তাওফীক হল। চিল্লা লাগানোর পর ২০ মাস বেসরকারী কলেজে এবং সাড়ে চৌত্রিশ বছর বিভিন্ন সরকারী কলেজে ইংরেজী বিষয়ে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত ছিলাম। অতঃপর ০১/০১/২০২১ তারিখে পি.আর.এল শেষে চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হলাম। অবসর হওয়ার ১৪ দিনের মাথায় গত ১৫/০১/২০২১ ঈসায়ী জুমাবার সকাল সাড়ে নয়টায় উলামায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে শূরায়ী নেযামের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশের তাবলীগী মারকায কাকরাইল মসজিদে গিয়ে নিজেকে পুরো যিন্দেগী দীনের মুবারক মেহনতের জন্য পেশ করলাম। হযরত মাওলানা যুবায়ের সাহেব দা.বা., মাওলানা রবীউল হক সাহেব দা.বা. ও মাওলানা ফারুক সাহেব দা.বা.-সহ অন্যান্য বড়দের উপস্থিতিতে বড় মশওয়ারার ফয়সালা মোতাবেক আমার আধা যিন্দেগী কবুল করা হল। সেমতে ১৯/০১/২০২১ ঈসায়ী মঙ্গলবার হতে আল্লাহর ফযল ও করমে আমিও আহলে কাকরাইলের অন্তর্ভুক্ত হলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আলহামদুলিল্লাহ!!! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই নেয়ামতের যথাযথ কদর করার তাওফীক দান করুন এবং সকল অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে সালামত রাখুন। আ-মীন)

হামদ সালাতের পর হযরত রহ. কুরআনে কারীমের এই আয়াত ও নিম্নলিখিত হাদীস পাঠ করেন–

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

(অর্থ:) বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। বল, তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত-১৪,১৫)

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلالاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

(অর্থ:) যখন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গরুর লেজ ধরে থাকবে, ক্ষেত-খামারে মত্ত হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন; তা আর তুলে নিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনের মেহনতে ফিরে আসো। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৪৬২, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৪৯৮৭)

অতঃপর বলেন–

মেরে দোস্তো আওর বুযুর্গো!

দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে তবকাত তথা শ্রেণীবিভাজন আছে। এটা দুনিয়াওয়ালারা জানে ও মানে। এক তবকা হলো মজদুর। এর চেয়ে উঁচু জমিদার। জমিদারের আয় মজদুরের চেয়ে বেশি। আরও উঁচু হলো ব্যবসায়ী। তাদেরও উঁচু শাসকশ্রেণী। তো দুনিয়াওয়ালাদের মধ্যে যেমন তবকাত রয়েছে; এক তবকা অপর তবকার চেয়ে উঁচু হয়। একইভাবে দীনের ক্ষেত্রেও তবকাত আছে। দীন ও ইসলামকে কে কতোটুকু আপন করে নিয়েছে এবং কে কতোটুকু দায়িত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করছে এর ভিত্তিতে এই তবকাত নির্ণীত হয়। দীনের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে তিনটি তবকা রয়েছে।

এক. এই তবকা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, ইসলামের পাঁচ স্তম্ভে ঠিক থাকলেই হলো! বিবাহ-শাদী, সন্তান প্রতিপালন, কামাই-রোজগারের ক্ষেত্রে ইসলাম জানেও না, মানেও না। এরা নামায, রোযাও করে আবার সুদ-ঘুষটও চালায়। খানাপিনা, পোশাক-আশাকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এরা ইসলাম মানে না। এই তবকা আধা ইসলাম, আধা গায়রে ইসলাম। এদের এক পা জান্নাতে আরেক পা জাহান্নামে। অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

(অর্থ:) তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর। শয়তানের তাবেদারী করো না; সে-তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা-২০৮) উল্লিখিত শ্রেণীটি উক্ত আদেশ মেনে চলছে না। এ তবকা বড়ই খতরনাক ও ভয়ঙ্কর!

দুই. এই তবকাটি উল্লিখিত তবকার একটু উপরে দীনওয়ালা তবকা। এরা নামায, রোযার সাথেসাথে লেবাস-পোশাক, খানা-পিনা, কামাই-রোজগারও ইসলামী তরীকায় করে থাকে। তবে এরা শুধু নিজেদের জান্নাতের ফিকির করে; নিচের তবকা জাহান্নামে গেলো কি জান্নাতে–সেটা নিয়ে তাদের কোন পরোয়া নেই। এরা নিচের তবকার সাথে মুহতাজ হয়ে মেলামেশা করে। নিচের তবকাকে নিজেরদের বড় ও মুরব্বী বানিয়ে চলে।

তিন. এই তবকা সবার উপরে। এরা হলো দাওয়াত দেনেওয়ালা তবকা। নিচের দুই তবকাকে দাওয়াতের কাজের সঙ্গে জোড়ানোকে এরা নিজেদের যিম্মাদারী মনে করে। এরা নিজেদের জীবনে লিল্লাহিয়াত, কানা'আত, আমানতদারী, আদল ও ইনসাফ এসে যায়, দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি মুশাহাদা থেকে হটে গায়েবের দিকে ঘুরে যায়, এর জন্য মেহনত করে।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

অর্থ: তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা ত্ব-হা-১৩১)

সবাই যাতে দুনিয়া থেকে দৃষ্টি হটিয়ে আখেরাতের দিকে দৃষ্টি রেখে চলে– এই তবকা তার ফিকির করে। এটি সবচেয়ে উঁচু তবকা। এই তবকায় যেমন উলামায়ে কেরাম থাকবেন, তেমন দাঈগণও শামিল থাকবেন। এই তবকা নিজের নীচের তবকাগুলোকে টেনে উপরে তোলার চেষ্টা করে। কিয়ামতের দিন এটি হবে সবচেয়ে উঁচু তবকা। এই তবকার শিরোমণি হবেন হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম। অতঃপর দীনের ক্ষেত্রে নবী ও সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণকারীগণ।

মেরে দোস্তো আওর বুযুর্গো!

ইখলাস ও কুরবানীর সাথে আখেরাতকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা অনুযায়ী চললে কাজ বনবে। পক্ষান্তরে মেহনত যতোই হোক, আগরায (ব্যক্তিস্বার্থ) জড়িত থাকলে বড়ই খতরা ও ভয়ানক আশঙ্কা রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে– 'কিয়ামতের আগে আগে মানুষ কথা বলবে চিনির চেয়ে মিষ্টি কিন্তু হৃদয় হবে বাঘের মত।' এমনিভাবে দাওয়াতের কাজ করনেওয়ালারাও তখন আগরায (ব্যক্তিস্বার্থ) পুরা করতে করতে চলবে। এট বড়ই খতরনাক। আখেরাতে এসব লোকের কোন পুরস্কার মিলবে না।

একবার জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ যদি জিহাদ করে কিন্তু তার ইখলাস নেই, সে কি গনীমতের মাল প্রাপ্ত হবে? নবীজী উত্তর দিলেন, মাল তো পাবে কিন্তু সাওয়াব পাবে না। আরেকজন প্রশ্ন করল– কেউ যদি বাহাদুরী দেখাবার জযবায় জিহাদ করে তার কী হবে? নবীজী বললেন, বাহাদুরী তো হবে কিন্তু সাওয়াব পাবে না। আরেকজন প্রশ্ন করল– কেউ জিহাদ করল কিন্তু সেইসঙ্গে শোহরতের (আত্মপ্রচার, জনপ্রিয়তার) জযবাও ছিল, তার কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শোহরত হবে কিন্তু সাওয়াব হবে না।

একবার জিহাদের ময়দানে একজন খুব বাহাদুরী দেখাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামী। শুনে এক সাহাবী আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এমন বাহাদুর আবার জাহান্নামী হয় কি করে?। হঠাৎ দেখতে পেলেন, ঐ লোকটি আহত হলো। এতে সে অধৈর্য হয়ে নিজের তলোয়ার নিজের বুকে গেঁথে আত্মহত্যা করল। সেই সাহাবী এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে সব শোনালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

لا يدخل الجنة الا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.

(অর্থ:) জান্নাতে শুধু মুমিনই প্রবেশ করবে, তবে আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে নাফরমান ব্যক্তি দ্বারাও সহায়তা করবেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৬০৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১১)

সুতরাং কারও দ্বারা দীন প্রসার লাভ করলেই আত্মহারা না হওয়া। নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকে তাকানো, ভয় করা। একবার একব্যক্তি জিহাদের ময়দানে নিহত হল। কেউ বলল, লোকটি জান্নাতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তার জন্য জাহান্নামের আগুন জ্বলছে। কারণ সে বিনাবণ্টনে একচাদর সম্পদ গনীমত থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তাই তার সব সওয়াব খতম। বড় হযরতজী ইলিয়াস রহ. বলতেন, পুলসিরাত যেমন তলোয়ারের চেয়ে ধার এবং চুলের চেয়ে চিকন, আমাদের এই দাওয়াতের রাস্তাও তেমন। এজন্য ভয় করতে করতে চলা। ইস্তিগফার করতে করতে চলা। দু'আ করতে করতে চলা। আর একবার বলেন, কাজ করনেওয়ালার উপর দু'টি আশঙ্কা রয়েছে–

এক. কাজ করে না, কিন্তু মনে করে যে, কাজ করছে। কাজ কী? নিজের মধ্যে ছয় নম্বর নিয়ে আসা; চাই তার দ্বারা জামাআত বেশি বের হোক আর কম বের হোক। কারও মধ্যে ছয় গুণের জয্‌বা বেড়ে গেলে সে কামিয়াব, চাই তার দ্বারা লোক বের হোক আর না হোক।

দুই. আসবাবের প্রতি দৃষ্টি যাওয়া। আসবাবের প্রতি দৃষ্টি গেলে আল্লাহর মদদ হটে যায়। যেমন হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১২০০০ আর কাফেরদের ছিল ৮০০০। তাদের মনে আসল, আজ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে আমরা পরাজিত হবো না। ফলে আসবাবের প্রতি দৃষ্টি যাওয়ার কারণে আল্লাহর মদদ হটে যাওয়ায় ১২০০০ ভয়ে ময়দান ছাড়লেন। এমনভাবে ছাড়লেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার কথাও মনে ছিল না ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলেন মাত্র দুইজন– হযরত আব্বাস রাযি., হযরত আবূ সুফিয়ান রাযি.। হযরত আব্বাস রাযি.-এর আওয়াজ নেহায়েত উঁচু ছিল। তাঁর চিৎকারে ১০০ জন ফিরে এলেন। অতঃপর বাকিরাও ফিরে এলেন। এর উসীলায় আট হাজারকে পরাজিত করা সম্ভব হলো।

আমরাও অনেক সময় বলি, 'এই তো পুরানা সাথী এসে গেছে, এবার কাজ উঠবে!' কিসের পুরানা! অধিকাংশই বয়ান করনেওয়ালা! মনে রাখতে হবে, হেদায়াত না মৌলবী সাহেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর না পুরানা সাহেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আসল কথা হলো, আসবাব বেশি হলে দু'আয় শক্তি কমে যায়। বলুন, কোন কাজের পর্যাপ্ত আসবাব

হাসিল থাকলে কেউ কি কেঁদে কেঁদে দুআ করে? সাধারণত করে না। পক্ষান্তরে আসবাবে ঘাটতি থাকলে নিজেকে কমযোর ভাবে আর কেঁদে কেঁদে দু'আ করে। এ কারণেই আসবাব যত বাড়ে দু'আর শক্তি কমে যায় আর আসবাব যত কমে দু'আর শক্তি বেড়ে যায়।

দাওয়াতের এই রাস্তা বড় আজীব-গরীব রাস্তা। আল্লাহ পাকের দিকে যতো দৃষ্টি রেখে চলা যাবে আল্লাহ পাকের সাহায্যও ততো আসবে। নিজেকে যতো ছোট মনে করে চলা যাবে দাওয়াতওয়ালা থেকে দু'আওয়ালা হওয়া যাবে।

দাওয়াত ও দু'আ শব্দের উৎসমূল একই– د ع و। দু'আ যতো শক্তিশালী হবে দাওয়াতও ততো শক্তিশালী হবে। আবার দাওয়াতে যে যতো কুরবানী করবে সে ততো দু'আওয়ালা বনবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সাহাবীর যতো কুরবানী ছিল তিনি ততো দু'আওয়ালা হয়েছেন। সর্বাধিক দু'আওয়ালা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর হযরত আবূ বকর রাযি.। তারপর হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-কে একবার ৭ দিন অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি বিস্ময়কর দু'আওয়ালা ছিলেন। যখন তাকে কূফার আমীর করে পাঠানো হয়, জনৈক ব্যক্তি তার ব্যাপারে কিছু মিথ্যা অভিযোগ তোলে। তিনি বদ দু'আ করেন যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার হায়াত দীর্ঘ হোক, ফিতনায় নিপতিত হোক এবং দীর্ঘ দারিদ্র্য চেপে বসুক। পরবর্তীকালে এমনটিই ঘটেছিল। এ ব্যাপারে বদদু'আগ্রস্ত লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলতো, এটা তো হযরত সা'দের বদদু'আ। [তাছাড়া হযরত সা'দ রাযি.-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন দু'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি সা'দের দু'আ কবুল করুন। (সুনানে তিরমিযী)] মোটকথা, হযরত সা'দ রাযি. দীনের জন্য অত্যন্ত কষ্ট বরদাশত করেন ফলে বড় দু'আওয়ালা বনে যান। এভাবে যে যতো কষ্ট করবে ততো দু'আওয়ালা বনতে পারবে। আমি তিন ব্যক্তিকে দু'আওয়ালা দেখেছি। হযরতজী ইলয়াস রহ.। মিয়াঁজী হাজী আব্দুর রহমান। মিয়াঁজী মুসা।

দু'আওয়ালা বনা যায় দীনের পথে কুরবানী অনুযায়ী। এখন তো দু'আ কবুল হওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে– যখন নেককাজের প্রচার-প্রসার ছেড়ে দিবে তখন আযাব আসবে। এ সময় তোমরা দু'আ করবে, দু'আ কবুল করা হবে না। হাদীস শরীফে ঐ আযাবকে যিল্লত (লাঞ্ছনা) বলা হয়েছে। এজন্যই বলা হয়, দাওয়াতওয়ালা আমল হলো দু'আওয়ালা আমল। কারণ, দীনের যে কোন শাখার দাওয়াত চলমান থাকলে সে শাখাটি অস্তিত্ববান, মজবুত ও সংরক্ষিত থাকে। এভাবে দীনের সকল শাখার দাওয়াত চলমান থাকলে পুরো দীন-ইসলাম শক্তিশালী ও বিজয়ী হয়। সুতরাং দীন যিন্দা করার এ মেহনতে লেগে গেলে আল্লাহ পাক দু'আওয়ালা বানাবেন, আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিবেন এবং যিল্লত ও লাঞ্ছনা থেকে বের করবেন।

কুরআন-সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার বনী ইসরাঈলের কথা আলোচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনটি তবকা ছিল– **এক.** দাওয়াত দেনেওয়ালা। **দুই.** নাফরমান। **তিন.** খামুশ (নীরব)। আল্লাহ তা'আলা দাওয়াত দেনেওয়ালাদেরকে নাজাত দেন। নাফরমান তবকাকে আযাব দেন। আর খামুশ তবকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাও খামুশ।

فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

(অর্থ:) যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে যায়, তখন যারা অসৎকার্য হতে নিবৃত্ত করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা জুলুম করে তারা কুফরী করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেই। (সূরা আ'রাফ-১৬৫)

খারাবী রোধ করার দু'টি পদ্ধতি আছে। **এক.** নামায না পড়লে এই এই শাস্তি হবে...। **দুই.** নামায পড়লে এই এই লাভ হবে।

মেরে দোস্তো আওর বুযুর্গো!

এই রাস্তা কুরবানীর রাস্তা। আমাদেরকে দুই জিনিসের কুরবানী পেশ করতে হবে। ১. জান। ২. মাল। কুরবানী করনেওয়ালার জীবনে বহু রকম অনাকাঙ্ক্ষিত হালত আসবে। অনাকাঙ্ক্ষিত হালত নবী আলাইহিমুস সালামের জীবনেও এসেছিল, সাহাবায়ে কেরামেরও এসেছিল। মূলত ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে আল্লাহ বান্দাকে পরখ করে নেন যে, সে খাঁটি কি না!। মনে রাখতে হবে, কাঙ্ক্ষিত- অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্ত হালত আমাদের তাকদীর ও ভাগ্যলিপি। আর তাকদীর বদলায় না। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করেছেন–

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

(অর্থ:) মুসীবত তো স্রেফ আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ অবগত। (সূরা তাগাবুন-১১)

কেমন বিস্ময়কর কথা! মুসীবত আল্লাহর তরফ থেকে আসে একথার উপর ঈমান আনলে হেদায়েত দেয়া হবে। একথা বুঝে সবর করলে হেদায়েত আসবে। হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর জীবনে মুসীবত এসেছিল মূলত তিনটি উদ্দেশ্যে– এক. তাদের ভুলচুক মার্জনা করা। দুই. তাদের মর্যাদা বুলন্দ করা। তিন. তাদের আযায়েমকে পোক্ত ও মজবুত করা।

মেরে দোস্তো আওর বুযুর্গো!

এই কাজ আম্বিয়াওয়ালা কাজ। সর্দারে আম্বিয়া, খাতামুল আম্বিয়া, খায়রুল বাশারের কাজ। এই কাজের বিনিময়ে বিশাল মর্যাদা হাসিল হবে। কী মর্যাদা হাসিল হবে? এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহপাক মানুষের অন্তরে তার মহব্বত পয়দা করে তাকে নিজের মাহবুব ও প্রিয়ভাজন বানিয়ে নিবেন। মূলত এই তবকার কারণেই দুনিয়ার নেযাম ও ব্যবস্থাপনা ঠিক মতো চলছে। অন্যথায়–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

(অর্থ:) মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। (সূরা রূম-৪১) এই মেহনত দ্বারা উম্মতের মধ্যে উম্মতপনা আসবে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ: মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত-১০) পারস্পরিক হুসনে তা'আল্লুক (সুসম্পর্ক) পয়দা হবে। আজ মুসলমান একে অপরের ইজ্জত নষ্ট করছে, বদদু'আ করছে। স-ব বন্ধ হবে। নামায খুশুওয়ালা হবে। রোযায় তাকওয়া আনবে। যাকাতে বদান্যতা আসবে। হজ্জের মাধ্যমে আপোসে জোড়-মিল আসবে। আমাদের বেশি

বেশি শোকর আদায় করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা দয়ামায়া করে আমাদেরকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন। এ কাজের উপর সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

(অর্থ:) যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ-০৬) এজন্য খুশি হওয়া চাই যে, আল্লাহ তার কাজে লাগিয়েছেন। আবার ভয়ও করতে থাকবে। যাতে নিয়ত না বিগড়ায়, পদস্খলন না হয়। বিশেষত যে সাথী মানুষের কাছ থেকে হাদিয়া পায়, যার হাত চুম্বন করা হয়, তার বেশি ভয় করা উচিৎ। সে যেন এই ইজ্জত-সম্মানকে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার ফলাফল মনে না করে বরং মনে করে যে, এটা মূলত সে যেই কাজে লেগে আছে সেই কাজের ইকরাম ও সম্মান। দেখুন না, মানুষ যখন কোন কারখানাওয়ালাকে সম্মান করে, তখন তারা মূলত কারখানাকে সম্মান করে। বলুন তো, দু'দিন পর যদি কারখানা শেষ হয়ে যায়, তখন কি কেউ তাকে সালাম করতে আসবে? আসবে না। অনুরূপভাবে যখন কোন সদর (President)-কে স্যালুট জানানো হয়, তখন মূলত সেই ব্যক্তিকে স্যালুট করা হয় না, বরং তার পদমর্যাদাকে স্যালুট করা হয়। মোটকথা, মানুষ কোন যাত (সত্তা)-কে সম্মান করে না; বরং সিফাত (গুণ)-কে সম্মান করে। এজন্য মনে করতে হবে যে, লোকেরা তো আমার হাত চুম্বন করছে না, কাজের হাত চুম্বন করছে; আমার ইকরাম করছে না, কাজের ইকরাম করছে। খুব ইয়াদ রাখুন! আমার মধ্যে তাকওয়া, লিল্লাহিয়াত, তাওয়াযু, আখলাক ও বে-নিয়াযী থাকলে ফেরেশতা, সমুদ্র, বাতাস, চাঁদ, সূর্য আমাকে সালাম করবে। এজন্য কেউ এই ধোকায় না পড়ি যে, আমার সম্মান হচ্ছে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

কোন এলাকায় দু'জন ভাই ছিলেন। একজন আলেম, অন্যজন যাহেদ (দুনিয়াত্যাগী)। এক ভাই ইলমের লাইনে উৎকর্ষ অর্জন করেন। অপর ভাই যুহদ ও বুযুর্গীতে কামালাত হাসিল করেন। একবার আলেম ভাই বাদশাহর কাছে আসলে বাদশাহ তার সঙ্গে মুসাফাহা করে ক্ষান্ত রইলেন; তেমন ইজ্জত-ইকরাম করলেন না। পক্ষান্তরে যাহেদ ভাইটি আসলে বাদশাহ তাকে দরজা থেকে এস্তেকবাল করলেন এবং খুব ইজ্জত-ইকরাম করে পাশে বসালেন। ব্যাপারটি উজিরের কাছে অন্য রকম মনে হলো। তিনি বাদশাহকে প্রশ্ন করলেন, আলেম ভাইকে ততোটা ইকরাম করা হলো না, যতোটা করা হলো যাহেদ ভাইকে? বাদশাহ বললেন, ঐ আলিম সাহেব কোন এক কাজে আমার কাছে একবার সুপারিশের জন্য এসেছিল। তাই সে আমার দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে। পক্ষান্তরে তার ভাইকে একটি জিনিস দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এজন্য আমার কাছে তার কদর বেশি।

বুঝা গেলো, দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী হলে ইজ্জত হাসিল হয়। কাজেই লোকদের থেকে মুস্তাগনী (অমুখাপেক্ষী) হয়ে চলা চাই। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে হবে, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর সামনে একলোক সম্পর্কে বলেন, লোকটা ভালো না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কোন কাজে নবীজীর কাছে আসলে তিনি তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? নবীজী উত্তর দিলেন, মানুষের সঙ্গে এভাবেই সাক্ষাৎ করা উচিৎ। এটাই দাওয়াতের মেজায। অনুরূপভাবে কাউকে খারাপ না বলা এবং কাউকে হাকীর (তুচ্ছ) মনে না করাও দাওয়াতের মেজায। হ্যাঁ, যার মধ্যে ইলম বেশি, যিকির বেশি তার ইকরাম বেশি করো। এটা হচ্ছে ইলম ও যিকিরের ইকরাম। কেননা শরীয়ত বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে সদাচরণের নির্দেশ দেয়। আলেম যেমনই হোক তাকে সম্মান করা চাই। ঠিক যেমন শুদ্ধ হোক ও ছাপার ভুল হোক কুরআনে কারীমের ইহতেরাম করা হয়। এটা জায়েয নেই যে, শুদ্ধ ছাপার কুরআন মাথার উপর রাখব আর ছাপার ভুল হলে পায়ের দিকে রাখব! আমরা পূর্ণ কুরআনের যেমন ইকরাম করব তেমনি কুরআনের এক আয়াতেরও ইকরাম করব। এটা দাওয়াতের মেজায। খুব ইয়াদ রাখুন, শয়তান তো হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমগণকেও পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত করেছে। তাহলে তাঁদের তুলনায় আমাদের কী হাইসিয়্যত? তবে নিরাপদ সেই ব্যক্তি, শয়তান বিবাদে লিপ্ত করলেও যে কিনা তাড়াতাড়ি মাফ করে দেয় এবং মাফ চেয়ে নেয়। এটাও দাওয়াতের মেজায। আপনারা আমার জন্যও দু'আ করুন, নিজেদের জন্যও দু'আ করুন।

[বি. দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালা অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী– অত্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শা'বান-২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেঝো সাহেবযাদা)]

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল : rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭, ০১৯১২০৭৪৪৯৫

ইসলামের শাশ্বত বিশ্বাস 'খতমে নবুওয়্যাত' অস্বীকারকারী 'কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (শেষ পর্ব)

ফাতাওয়া বিভাগ: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আমরা সকল মুসলমান জানি এবং বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল; তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। ইসলামী শরীয়তে বিষয়টিকে 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত' বলে উল্লেখ করা হয় এবং এটি দীনের অপরিহার্য একটি আকীদা বা বিশ্বাস। খতমে নবুওয়্যাত অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 'কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত' নামে একটা গোষ্ঠী 'খতমে নবুওয়্যাতের আকীদা' অস্বীকার করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'মুসলিম জামাত' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী, যে কিনা নিজেকে ইমাম মাহদী, ঈসা-মসীহ এমনকি নবী বলেও দাবী করেছে। অনুরূপভাবে এই কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত ইসলামের স্বকীয়তাজ্ঞাপক পরিভাষা যথা: 'ইসলাম', 'মুসলিম', 'মসজিদ', 'উম্মুল মু'মিনীন', 'সাহাবী', 'কালিমা তায়্যিবা', প্রভৃতি ব্যবহার করে সহজ-সরল মুসলমানদেরকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে মুসলমানদের ঈমান ও আমল বরবাদ করার জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

এমতাবস্থায় মুসলমান ভাই-বোনদের বিশুদ্ধ আকীদা এবং সহীহ ঈমান-আমল হেফাযত করার লক্ষ্যে 'খতমে নবুওয়্যাতের আকীদা' বিষয়ক সুস্পষ্ট বিবরণ জাতির সামনে তুলে ধরে 'কাদিয়ানী আহমদিয়া-মুসলিম জামাতে'র ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরী। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের দলীলসহ জবাব প্রদান করে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আমল সংরক্ষণে আপনাদের বলিষ্ঠ রাহনুমায়ী প্রত্যাশা করছি।

প্রশ্নগুলো এই–

এক. 'খতমে নবুওয়্যাত' সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য কী?

দুই. কাদিয়ানী ধর্মমত ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী?

তিন. কাদিয়ানী ধর্মমতের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বিধান কী?

চার. কাদিয়ানীরা কি নিজেদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে ও লেখা-লেখনীতে 'ইসলাম', 'মুসলিম', 'মসজিদ', 'উম্মুল মু'মিনীন', 'সাহাবী', 'কালেমা তায়্যিবা' প্রভৃতি পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করার অধিকার রাখে?

[উল্লেখ্য, দ্বিমাসিক রাবেতার গত সংখ্যায় (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১) এক ও দুই নং প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছিল। এ সংখ্যায় তিন ও চার নং প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হচ্ছে।]

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে সর্বশেষ ধর্ম ইসলাম প্রেরণ করে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন–

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه..

(অর্থ:) আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো পথকে দীনরূপে গ্রহণ করবে আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও তার থেকে সেই দীন গ্রহণ করবেন না। (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে ইমাম রাযী (মৃ.৬০৬হি.) রহ. বলেন–

وأن كل دين سوى الإسلام فإنه غير مقبول عند الله، لأن القبول للعمل هو أن يرضى الله ذلك العمل، ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه، ولذلك قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين [المائدة: ٢٧] ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الإسلام فكما أنه لا يكون مقبولا عند الله، فكذلك يكون من الخاسرين، والخسران في الآخرة يكون بحرمان الثواب، وحصول العقاب،

অর্থাৎ ইসলাম ব্যতীত কোনো ধর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আমল কবুল হওয়ার অর্থ হলো ঐ আমল আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হওয়া এবং আমলকারীকে তার জন্য নেকী প্রদান করা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– (অর্থ:) আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেযগারদের থেকে আমল কবুল করেন। (সূরা মায়িদা-২৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে কেউ ইসলাম ভিন্ন কোনো দীনকে গ্রহণ করবে, তো একদিকে যেমন এই দীন আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না অপরদিকে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্ম গ্রহণ করার কারণে সে আখেরাতে কোনো সওয়াব তো পাবেই না বরং আযাবে গ্রেফতার হবে। (তাফসীরে কাবীর খ. ৮ পৃ. ২৮২)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (মৃ.৭৭৪হি.) বলেন–

فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل، وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله، وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} أي: من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه {وهو في الآخرة من الخاسرين} كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.[১]

অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে যারা মুমিন হবে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সকল নবী এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখবে। এ সবের কোনো কিছুই তারা অস্বীকার করবে না বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কিতাব এবং প্রেরিত সকল রাসূলকে সত্য মনে করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– (অর্থ:) 'যে কেউ ইসলাম ভিন্ন কোনো দীনকে গ্রহণ করবে আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও তার থেকে সেই দীন গ্রহণ করবেন না।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন পন্থা অবলম্বন করবে যার অনুমোদন আল্লাহ তা'আলা দেননি, সে পন্থা আল্লাহ তা'আলা কখনোই গ্রহণ করবেন না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে,

---

(١) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (برقم ١٨١٧) عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبوب به الإمام البخارى (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولم يخرجه (صحيح البخاري ٩/ ١٠٧ رقم الحديث ٧٣٥٠ طـ دار طوق النجاة،)

যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– (অর্থ:) যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর খ. ২ পৃ. ৭০)

সুতরাং ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলে 'আহমদিয়া..... জামাত' নামে নব্যগঠিত কাদিয়ানী ধর্ম-মতও উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী অগ্রহণযোগ্য। কেননা তারা নবীজী আলাইহিস সালামকে শেষ নবী না মানার দরুন সুস্পষ্ট কাফের। আর 'আহমদিয়া..... জামাত-এর অনুসৃত ভণ্ড নবী-দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত মিথ্যুকদের ব্যাপারে তো নবীজী আলাইহিস সালাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন–

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ... ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريبا من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله

(অর্থ:) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ... ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবৎ না প্রায় ত্রিশজনের মত কট্টর মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে, যাদের প্রত্যেকেই মনে করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬০৯)

(তাছাড়াও মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কর্তৃক গঠিত 'কাদিয়ানী' ধর্মের অনুসারী 'আহমদিয়া.......জামাত'-এর লোকেরা যেহেতু 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত'কেও অস্বীকার করে, কাজেই তাদের ব্যাপারেও কুরআন-সুন্নাহর এই একই বক্তব্য, যে বক্তব্য খতমে নবুওয়্যাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে প্রদত্ত হয়েছে।)

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুনাফিকগোষ্ঠী কর্তৃক মসজিদে যিরার নির্মাণের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল মুমিন-মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা এবং পরস্পরে লড়াই বাধিয়ে দেয়া।

আল্লামা তাবারী রহ. (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন–

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام: والذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالله لمحادتهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرقوا به المؤمنين، ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا،

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, মুনাফিকরা কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে এই লক্ষ্যে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের (মসজিদে কুবা'র) ক্ষতি সাধন করবে, এর মাধ্যমে নবীজীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মিশন সফল করবে এবং মুমিনদেরকে বিভক্ত করে দিবে। আর তার পদ্ধতি হলো– কিছু মুসলমান নবীজীর মসজিদে নামায পড়বে আর কিছু তাদের মসজিদে। এভাবে মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য তৈরী হবে, ফলে তারা পরস্পরে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (তাফসীরে তাবারী খ. ১৪ পৃ. ৪৬৯)

নবীজী আলাইহিস সালাম বিষয়টি জানতে পেরে মসজিদ নামক ঐ ষড়যন্ত্রের আখড়াটিকে গুড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঐ স্থানটিকে ডাস্টবিনে পরিণত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা মুনাফিকরা ইসলামের প্রতীক ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছিলো।

আল্লামা আলূসী রহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) উল্লেখ করেন–

وذكر البغوي من حديث ذكره الثعلبي– كما قال العراقي– بدون سند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد حرق المسجد وهدمه أن يتخذ كناسة يلقي فيها الجيف والنتن والقمامة إهانة لأهله لما أنهم اتخذوه ضرارا،

অর্থাৎ কুবায় মুনাফিক কর্তৃক নির্মিত মসজিদে যিরারকে ভেঙ্গে পুড়িয়ে দেয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে ডাস্টবিন বানিয়ে ময়লা-অবর্জনা ফেলার নির্দেশ দিলেন মুনাফিকদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য। কেননা তারা এই স্থানকে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের মাধ্যম বানিয়েছিলো। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী; খ. ৬ পৃ. ১৮)

মুসলমানদের বেশ-ভূষা ধারণ করে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার কারণে একবার তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর খুৎবার সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুনাফিকদের নাম ধরে ধরে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

আল্লামা আলূসী রহ. লিখেছেন–

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط(٢) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبا فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرجهم بأسمائهم

(অর্থ:) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একবার নবীজী আলাইহিস সালাম জুমু'আর দিন খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন– হে অমুক! বের হও কারণ তুমি মুনাফিক; হে অমুক তুমিও বের হও কারণ তুমিও মুনাফিক। এভাবে একে একে তাদের নাম ধরে ধরে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৬ পৃ. ১২)

সুতরাং বুঝা গেলো, ইসলাম বা মুসলমানদের বেশ-ভূষা কাজে লাগিয়ে কেউ ইসলামের ক্ষতি করতে চাইলে তাকে সে সুযোগ কখনোই দেয়া যাবে না। কাজেই কাফের কাদিয়ানীদের জন্য কালিমা, সাহাবা, মুসলিম, উম্মুল মুমিনীন– এর মত ইসলামের শি'আর ও স্বকীয়তাজ্ঞাপক পরিভাষা ব্যবহার করার যেমন অধিকার নেই, তেমনি মুসলমানদের জন্য তাদেরকে এ সকল পরিভাষা ব্যবহারের সুযোগ প্রদানেরও কোনো অবকাশ নেই।

তাছাড়া ইসলাম, মুসলিম, মসজিদ, মুমিন, কালিমায়ে তায়্যিবা প্রভৃতি ইসলামের স্বকীয়তাজ্ঞাপক-পরিভাষাসমূহ একান্তই ইসলামের অধিকার এবং সকলেই এই পরিভাষা দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গকে বুঝে থাকে, যারা আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাতে বিশ্বাসী। অপরদিকে আহমদিয়া..... জামাতের অনুসারীরা যেহেতু কাফের তাই এটা কখনোই ইনসাফের দাবী হতে পারে না (বরং এটা স্পষ্টত যুলুম বটে) যে, যারা মুসলমান নয় তাদেরকে মুসলমানদের পরিভাষা ব্যবহারের অধিকার দেয়া হবে।

'মাহ্নামা বায়্যিনাত' নামক পত্রিকায় জামি'আতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বানূরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান-এর ফাতাওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত দুটি ফতওয়া নিম্নে প্রদত্ত হলো–

سوال: مساجد میں خدا اور اس کے ذکر سے اور رسول خدا کے ذکر سے احمدیوں کو روکنا اور ہم سے یہ کہنا کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنائیں اور مسجد میں خدا اور اس کے رسول کا نام نہ لیں کیا یہ سب کچھ آپ کے نزدیک اسلامی طریقہ ہے؟

---

(٢) أخرجه الإمام الطبراني فى معجمه الأوسط (برقم ٧٩٢) عن ابن عباس في قوله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبا، فقال: قم يا فلان فاخرج، فإنك منافق، اخرج يا فلان، فإنك منافق ، فأخرجهم بأسمائهم، ...

سحواب نعد ۔یہ م مرتین ، کے تحت متعدد احادیث روح المعانی میں مذکور ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے نکالا اس لئے یہ عمل تو عینِ سنتِ نبوی ہے

سوال: احمدیوں کو مسجدیں بنانے سے جبراًروکا جارہا ہے کیا یہ اسلام میں آپ کے نزدیک جائز ہے؟

جواب: آنحضرت انے مسجد ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا ؟اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے ؟شاید جناب کے علم میں ہو گا ،اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ آپ حضرات دراصل رنج کی وجہ سے معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں دیکھئے اس بات پر تو غور ہو سکتا تھا(اور ہوتا بھی رہا ہے) کہ آپ کی جماعت کے عقائد مسلمانوں کے سے ہیں یا نہیں ؟اور یہ کہ اسلام میں ان عقائد کی گنجائش ہے یا نہیں؟ لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کی جماعت کے نزدیک مسلمان ، مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی جماعت مسلمان نہیں ؟تو خود انصاف فرمایئے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کرسکتے ہیں ؟اور ازروئے عقل وانصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی حقوق دینا ظلم ہے ؟یا اس کے برعکس نہ دینا ظلم ہے ؟ میرے محترم !بحث جبر واکراہ کی نہیں ، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جو عقائد اپنے اختیار وارادہ سے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ؟ اگر ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے ، نہیں ہوتا تو یقینا بے جا ہے ۔اس اصول پر تو آپ بھی اتفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہیئے ۔اب آپ خود ہی فرمایئے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے ؟اور کن چیزوں کے انکار کر دینے سے اسلام جاتا رہتا ہے اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو سمجھ سکیں گے جو غصہ کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔ فتاوی بینات ۱/۲۱۵-۲۱۶ (ط-مکتبۂ بینات)

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের সিদ্ধান্ত।

মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসারী 'আহমদিয়া ..... জামাত'-এর খপ্পর থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হেফাজত করার লক্ষ্যে তাদের ঈমান বিধ্বংসী আকীদার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতোমধ্যেই তাদেরকে কাফের বলে ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালে বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র উদ্যোগে পবিত্র মক্কা মুকাররমায় আয়োজিত কনফারেন্সে ১৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্র এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, 'কাদিয়ানীরা কাফের, তাদের তাফসীর বিকৃত এবং তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে ও পথভ্রষ্ট করছে।'

১৯৮৮ সালে ওআইসি'র উদ্যোগে ইরাকে সকল মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীদের নিয়ে আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রত্যেক মুসলিম দেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়। সে মতে সৌদী, ইরাক, ইরান, কুয়েত, মালয়েশিয়া-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তান গণপরিষদও ১৯৭৪ ঈসায়ীর ৭ সেপ্টেম্বর আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সম্প্রদায় বলে ঘোষণা দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাগরিষ্ঠ-মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি। তবে উলামা-মাশায়েখ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাদিয়ানীদের প্রোপাগাণ্ডা প্রতিরোধ করতে সোচ্চার রয়েছেন।

সমাজের যে সকল মুসলমান 'কুফর' এবং 'বাতিলে'র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করবে না, তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে বলে হাদীস শরীফে ধমকি এসেছে।

হযরত জারীর রাযি. বর্ণনা করেন,

عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا"

(অর্থ:) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সমাজের কোন লোক নাফরমানীতে লিপ্ত হলে, ঐ সমাজের লোকেরা তাকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সে সমাজের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই শাস্তি প্রদান করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪৩৩৯, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩০০)

কাদিয়ানী-ধর্মান্তরের ফেতনা; উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের জন্য জরুরী হলো, কাদিয়ানীরা যে খতমে নবুওয়্যাতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং কালিমায়ে তায়্যিবা, মুমিন, মুসলমান জাতীয় ইসলামের স্বকীয়তাজ্ঞাপক পরিভাষা ব্যবহার করার মতো অনধিকার চর্চার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কাফের বানানোর ষড়যন্ত্র করছে, তাদের এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বল প্রয়োগ করে, প্রয়োজনে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ অপকর্ম বন্ধের ব্যবস্থা করা, সাথে সাথে কাদিয়ানী মতবাদের বিরোধিতা এবং এর মূলৎপাটোনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

كنتم خير أمة أخرجت للناس...

(অর্থ:) তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত; মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ। (সূরা আলে ইমরান-১১০]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

(অর্থ:) তোমাদের কেউ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ দেখলে সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। (অর্থাৎ বাধা দেয়।) যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা। (অর্থাৎ মৌখিকভাবে প্রতিহত করে।) তাও সম্ভব না হলে যেন অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৮)

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন–

وقيل: المعنى إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان، لأنه إذا رأى منكرا معلوما من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه، ورضي به واستحسنه كان كافرا،

অর্থাৎ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, পাপাচারে সরাসরি বাধা না দিয়ে শুধুমাত্র অন্তরে ঘৃণা করাকে হাদীস শরীফে ঈমানের দুর্বলতম স্তর বলার কারণ হলো, যখন কেউ শরীয়তের অবশ্যমান্য বিষয় লঙ্ঘিত হতে দেখেও তাতে বাধা না দেয় এবং অন্তর দিয়ে ঘৃণাও না করে বরং সে তাতে খুশী হয় এবং কাজটিকে ভালো মনে করে তখন তার ঈমান থাকে না, বরং সে কাফের হয়ে যায়। (মিরকাত খ. ৯ পৃ. ৩২৩)

কাজেই সর্বাত্মকভাবে কাদিয়ানীদেরকে কাফের প্রচার করা এবং তাদের ধর্মপ্রচারে বাধা প্রদান করা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের ঈমান-আমল হেফাযতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঈমান সুরক্ষায় কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন!

মুফতী উমর ফারূক বিক্রমপুরী দা.বা.

আমাদের সমাজে সামাজিকতা ও নিয়মনীতি পালনের নামে বহু কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলন রয়েছে। শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এর মধ্যে কিছু আছে নাজায়েয ও বিদ'আত পর্যায়ের আর কিছু আছে কুফর ও শিরক পর্যায়ের। নাজায়েয ও বিদ'আত, কুফর ও শিরক প্রতিটিই ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই কুসংস্কারগুলোর বেশীরভাগই বিজাতি, বিধর্মী বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের রীতি ও প্রথা থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। অনেক ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমান অজ্ঞতাবশত এ সকল কুসংস্কারকে ধর্মীয় আবেগ নিয়ে খুব আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে পালন করে থাকে। আবার অনেক আধুনিক ব্যক্তিবর্গ এগুলোকে ফ্যাশন বা উন্নত কালচার মনে করে পালন করে। অথচ ঈমান হেফাজতের জন্য প্রতিটি মুসলমানের এ সকল কুসংস্কার থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দূরে থাকা কর্তব্য। যে সকল কুসংস্কার থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা অতিআবশ্যক সেগুলোর কিছু এই–

১. যেসব লোকের পরপর কয়েকজন সন্তান অল্প বয়সে মারা যায় তাদের কোন সন্তান বেঁচে গেলে সেই সন্তানের বিচিত্র সব নাম রাখা হয়। যেমন ফেলানী, হেলানী, টেপা, পঁচা, ইত্যাদি। তারা মনে করে এরকম আজেবাজে ও শ্রুতিকটু নাম রাখলে এর প্রতি আজরাইলের নজর থাকে না, ফলে সন্তানটি বেঁচে যায়। এভাবে পরপর কয়েকজন মারা যাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া সন্তানটিকে 'মল্লি ছেলে' বলা হয়। অতঃপর এই মল্লি ছেলের এক কান ফুটো করে তাতে ছোট একটা লোহা/তামা/পিতল ইত্যাদির রিং পরিয়ে দেয়া হয়। অনেকে আবার এরূপ ছেলের মাথার পিছন দিকের কিছু চুল না কেটে অনেক লম্বা করে রাখে। এর দ্বারা নাকি ছেলে শিশুকে মেয়ে বানিয়ে আজরাইলকে ধাঁধায় ফেলে ফাঁকি দেয়া হয় এবং মেয়ে মনে করে হযরত আজরাইল তাকে ফেলে যায় আর এই ফাঁকে ছেলেটি বেঁচে যায়। তাদের ধারণায় মেয়ে সন্তানের প্রতি আজরাইলের আকর্ষণ কম, আর ছেলে সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বেশি। এ সকল ধারণা সম্পূর্ন অমূলক, মিথ্যা, ভ্রান্ত ও কুফরী। এর দ্বারা ঈমানের মারাত্মক ক্ষতি হবে। কারণ উল্লিখিত সকল কাজই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। সন্তানের জীবন আল্লাহই দেন আবার মৃত্যুও আল্লাহই দেন। হযরত আজরাইলের হাতে এরূপ কোন ক্ষমতা নেই। তিনি তো কেবল আল্লাহর হুকুমের গোলাম। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে ছেলে দেন এবং মেয়েও তিনিই দেন। তার নিকট ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণুও তার সামনে পরিষ্কার। অতএব এ সকল আজেবাজে নাম দিয়ে বা ছেলেকে মেয়ে বানিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়া বা তাকে ধাঁধাঁয় ফেলা সম্ভব নয়। তাই এ সকল ঈমান বিধ্বংসী চিন্তাধারা ও কুসংস্কার থেকে সকলের বিরত থাকা জরুরী।

২. অনেক মুসলমান সন্তানদেরকে আদর-সোহাগ করে লক্ষ্মী বলে ডাকে। বলে– 'তুমি আমার সোনা, ময়না, লক্ষ্মী! আবার ছেলে-মেয়ে বুদ্ধিমান হলে, কাজকর্মে মনোযোগী হলে বলে, 'আমার ছেলেটা/মেয়েটা খুব লক্ষ্মী।' অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও লক্ষ্মী কথার প্রচলন আছে। তারা বলে, 'কাস্টমার হলো দোকানের লক্ষ্মী, কাস্টমারের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।' আবার ব্যবসায় উন্নতি হলে বলে, 'আমার দোকানে লক্ষ্মী আছে।' এগুলো ঈমানবিধ্বংসী কথা। লক্ষ্মী মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ দেবতার নাম। অনুরূপভাবে হিন্দুরা লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী বলে শুভ-অশুভে বিশ্বাস করে এবং লক্ষ্মী দেবতার সন্তুষ্টির জন্য লক্ষ্মীপূজা করে। কিন্তু ইসলামে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী তথা শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে থাকে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই ঘটে থাকে। পবিত্র কুরআনে আছে–

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

(অর্থ:) হুকুম চলে কেবলই আল্লাহর। (সূরা আন'আম-৫৭)

সুতরাং হিন্দুদের দেখাদেখি কোন মুসলমানের জন্য সন্তান বা অন্য কিছুকে কাউকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করা কিছুতেই বৈধ হবে না এবং শুভ-অশুভে বিশ্বাস করাও জায়েয হবে না। এত ঈমানের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

৩. ছোট শিশুকে নিয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে শিশুর বাবা-মা অথবা অভিভাবক শিশুর কপালের এক পাশে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দেয়, যাতে শিশুর উপর কারো নযর না লাগে এবং এতে নাকি শিশুটি অমঙ্গল থেকে রক্ষা পায়। এটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কুসংস্কার এবং ঈমানবিরোধী কাজ।

৪. শিশুদের দুধের দাঁত পড়ে যখন নতুন দাঁত গজায় তখন নতুন দাঁতটি যাতে সুন্দর হয়, সে জন্য পড়ে যাওয়া দাঁতটি ইঁদুরের গর্তে ফেলে বলা হয়; 'ইঁদুর ভাই! ইঁদুর ভাই! পঁচা দাঁত নিয়ে যাও, ভালো দাঁত দিয়া যাও।' এটা বললে নাকি শিশুর নতুন গজানো দাঁত সুন্দর ও মজবুত হয়। এটা সম্পূর্ণ অমূলক, কুসংস্কার এবং শরীয়তবিরোধী নাজায়েয কাজ। ইঁদুরের সাথে মানুষের দাঁত ভালো-মন্দ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে ইঁদুরেরও কিছুই করার ক্ষমতা নেই। বাস্তবে সে কিছু করেও না। বরং সব কিছু আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে।

৫. যাত্রাকালে কালো বিড়াল, ঝাড়ু, খালি কলস, পেঁচা ইত্যাদি দেখলে অথবা কোন নিঃসন্তান লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নাকি যাত্রা নাস্তি হয়, শুভ হয় না। এ ছাড়া যাত্রাকালে পেছন থেকে ডাকা, হাঁচি দেয়া ইত্যাদিকেও অমঙ্গলকর মনে করা হয়। আবার যাত্রা শুরু করার সময় কেউ হোঁচট খেলে বা কোন জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে একটু অপেক্ষা করে পুনরায় যাত্রা শুরু করে। এতে নাকি ঐ অমঙ্গলটা আর থাকে না এবং অমঙ্গলের আশংকাটা কেটে যায়। শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই; সবই ভ্রান্তবিশ্বাস ও কুসংস্কার।

৬. কেউ কেউ বলে, বাপ-কাঠামো মেয়ে ভাগ্যবতী আর মা-কাঠামো ছেলে ভাগ্যবান হয়। এটাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারো ভাগ্যের সঙ্গে তার নিজের কিংবা অন্য কারও গঠন-কাঠামোর সম্পর্ক নেই। মানুষের কিসমত তথা ভাগ্য তো তার জন্মের পূর্বেই লিখা হয়ে গিয়েছে। এখন জন্মের পরে এসে শারীরিক গঠনের সঙ্গে ভাগ্য নির্ধারণের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

৭. শিশু কর্তৃক পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে হাঁটা নাকি অসুখ-বিসুখ ডেকে আনার লক্ষ্মণ। এ কারণে পায়ের আঙ্গুলে ভর

দিয়ে হাঁটা শিশুকে মুরব্বীরা ধমক দিয়ে বলে– 'ভালো করে হাঁট্, এভাবে হেঁটে বিপদ ডেকে আনবি নাকি? এ বিশ্বাসটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এভাবে হাঁটার সঙ্গে অসুখ-বিসুখ ডেকে আনার কোনও সম্পর্ক নেই।

৮. অনেকে মনে করে, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ডিম খেতে নেই। কারণ এতে নাকি পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ার আশংকা থাকে। এটা অমূলক ও ভুল বিশ্বাস। কারণ ডিমের সঙ্গে পরীক্ষার ভালো-খারাপের কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া কারও ক্ষতি করার জন্য ডিমের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। বরং ডিম একটি পুষ্টিকর খাদ্য। এটা খেলে শরীর-স্বাস্থ্য সবল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এই অমূলক বিশ্বাস পরিহার করা আবশ্যক।

৯. খাবার রান্না করার পর স্ত্রীরা স্বামী বা গৃহকর্তার আগে খেয়ে নিলে নাকি স্ত্রীর অমঙ্গল হয়। এ জন্য স্ত্রীরা নিজেদের প্রবল ক্ষুধা লাগা সত্ত্বেও স্বামীর খানা খাওয়ার আগে নিজেরা খায় না; বরং স্বামীর খানা শেষ হলে তারপর খায়। অনেক সময় স্ত্রী আগে খেলে স্বামী রাগও করে। এটা সম্পূর্ণ অমূলক কল্পনা। খানার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যখন যার প্রয়োজন হবে তখন সে খেয়ে নিবে। স্ত্রী প্রয়োজনে স্বামীর আগেও খেতে পারবে। এতে তার অমঙ্গলের কিছুই নেই। প্রয়োজন না হলে পরেও খেতে পারবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্ত্রীদেরকে নিয়ে একসঙ্গে খানা খেতেন।

১০. অনেকে রাতের বেলা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে না। এতে নাকি অমঙ্গল হয়। একান্ত প্রয়োজনে গাছের কাছে নাকি তিনবার অনুমতি নিয়ে ছিঁড়তে হয়। এটাও অমূলক ধারণা। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

১১. অনেক এলাকায় কুরবানীর পশু যবাই করার সময় ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্ত সংগ্রহ করে ফলবান গাছের গোঁড়ায় ঢেলে দেয়া হয়। এতে নাকি গাছটি ফল বেশী দেয়। শরীয়তে এই ধারণারও কোন ভিত্তি নেই।

১২. কোন কোন এলাকায় নদীভাঙ্গন রোধ করার জন্য 'গঙ্গার মা'-এর নামে নদীতে যিন্দা মুরগী, ছাগল ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া হয়। আবার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কলাপাতায় রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এতে নাকি নদীভাঙ্গন রোধ হয়। এটা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন, গর্হিত ও সুস্পষ্ট শিরক। এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

১৩. খানা খাওয়ার সময় হাঁচি আসলে বলা হয়, কেউ তোমাকে স্মরণ করছে। ডান হাতের তালু চুলকালে বলা হয়, তোমার হাতে টাকা আসবে। বাম চোখ একাএকা লাফাতে থাকলে বলা হয়, তোমার অমঙ্গল হবে। দাঁড়কাক ডাকাডাকি করলে প্রিয়জনের দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ইঙ্গিত মনে করা হয়। এগুলো সবই নিছক কুসংস্কার। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং মাখলুকের জীবনে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উল্লিখিত ভ্রান্ত আকীদা ও গর্হিত কর্মকাণ্ডসহ সকল ঈমানবিধ্বংসী বিশ্বাস ও কর্ম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

লেখক পরিচিতি: সিনিয়র শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, বিভাগীয় সম্পাদক, মাসিক আদর্শ নারী।

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমাতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এল.সি কালো পাথর আমদানীকারক

এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
হাউজ # ৩/৩/১৫, রোড # ৪
চাঁনমিয়া হাউজিং, বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৬৭১০৭১১, ০১৮৭৬০০৩৫১৮

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

সোহবতে মোরে ধন্য করো হে কাবার মালিক!

মাওলানা ওবায়েদ আহমাদ

ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখিয়ে দাদী বলেছিলেন, কালো ঘরটা কাবা আর সবুজ গম্বুজটা মদীনা। পাঁচ বছর বয়সে চোখভরা বিস্ময় নিয়ে দাদীকে হাজারটা প্রশ্ন করি। প্রশ্নজট খুলে যেতেই অজান্তে ভালোবেসে ফেলি কালো ঘর আর সবুজ গম্বুজকে। মাগরিব সন্ধ্যায় প্রায়ই ছবি দু'টোর সামনে দাঁড়াই। অস্ফুটস্বরে ভালোবাসার কথাগুলো বলি। সেই থেকে আজ পনেরো বছর পার হলো। পরিণত এই কিশোরবেলায় স্বপ্নগুলো জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। ঘোরলাগা স্বপ্নগুলোকে ছুঁতে পারবো ভেবে আবারো বিস্মিত হই। কল্পলোকে ভাসে দাদীর ছবি। মনে পড়ে দাদীর কথাগুলো– কালো ঘরটা কাবা আর সবুজ গম্বুজটা মদীনা। আশিউর্ধ্ব বয়োবৃদ্ধা দাদী গুণগুণ করে আবৃত্তি করতেন– 'মদীনার মাটি মোর লাগিবে ভালো, মদীনার বাতাস মোর লাগিবে ভালো, আমায় নিয়া যাও গো মদীনা।'

সুদূর মদীনা থেকে নিয়ে আসা সাদা তসবীহ জপতেন আর ঝাপসা চোখে আঁকতেন কাবার ছবি। মুক্তোদানার মতো তার কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়তো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। দাদীর সেই স্বপ্নের দেশে, ভালোবাসার মাটিতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পা রাখার তাওফীক দান করলেন গত ১১ মে ২০১৮ ঈসায়ী, রোজ বৃহস্পতিবার। আমরা বলতে আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী উস্তাযুল আসাতিযা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা., ঢাকা মেডিকেলের এনেসথেসিয়া ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডা. শামসুল বারী সাহেব, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তারেক ভাই, তাঁর স্ত্রী-শ্বশুর, আমরা চার ভাইবোন আর বাবা-মা। ১১ জনের এই কাফেলা নিয়ে সাউদিয়া এয়ারলাইন্স রাত ২:৩০ মিনিটে যাত্রা করে সৌদির উদ্দেশ্যে। রাতের আকাশে মেঘ কেটে উড়ে চলে বিমান। বুকটা দুরুদুরু করে। সাদা মেঘের মতো উড়ে চলা স্বপ্নগুলো কি সত্যিই আমি ছুঁয়ে দেখবো। আবেগ উত্তেজনায় চোখে পানি আসে। ঝাপসা চোখে ভেসে উঠে দাদীর ছবি। মদীনার সাদা তাসবীহ হাতে চোখভর্তি সপ্ন আর বুকভরা আশা নিয়ে কাঁদছেন আমার দাদী। মদীনার মাটি আর বাতাসের জন্য। মক্কার কালো ঘর ছুঁয়ে দেখার জন্য।

সৌদি সময় দুপুর ১১ টায় সাউদিয়া এয়ারলাইন্স স্পর্শ করলো হেজাযের মাটি। এয়ারপোর্টের ঝক্কি-ঝামেলা শেষে দু'টো সাদা ক্যাব যোগে ছুটলাম মক্কার মিলিনিয়াম হোটেলে। হিলটন নামে হোটেলটির পরিচিতি থাকলেও চলতি বছর নতুন কোম্পানী, মিলিনিয়াম নামে হোটেলটির যাত্রা শুরু করে। পথে চোখে পড়লো কংক্রিটের তৈরি নান্দনিক মক্কা গেট। কুরআন-রেহালের প্রতিকৃতি দিয়ে তৈরি এই গেটটি রাতের বেলা নিয়ন আলোয় অদ্ভুত এক মোহ সৃষ্টি করে। মক্কা গেট পার হতেই দূর থেকে দেখা দিলো মক্কা টাওয়ারের বিশাল ঘড়ি। মিলিনিয়ামে পৌঁছুতে বেজে গেলো ১২ টা। হোটেল রিসিপশনে সহাস্যবদনে এগিয়ে এলেন ইসমাঈল সাহেব। মক্কায় আগত এস এন ট্রাভেলসের হাজী সাহেবানদের নেগরান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। হোটেলের রুম বুকিং এবং চড়ামূল্যে হোটেলের খাবারের বিকল্প হিসেবে তিনবেলা দেশী খাবার পরিবেশনসহ যাবতীয় খোঁজ-খবর রাখছিলেন। হোটেলের রুম মিললো দুপুর দেড়টায়। জুমু'আর দিন ছিলো। তাই জুমু'আর জামা'আতে শরীক হওয়ার আগ্রহও ছিলো বেশ। মক্কার হরমে জুমু'আর নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হলো। হরমের উঠোনজুড়ে টাইলস বসানো অসংখ্য পিলার। পিলারের দুইপাশে বসানো ফ্যানের বাতাসে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন এক পশলা বৃষ্টি এসে গায়ে পড়ে। ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উত্তাপ কমাতেই এই হাওয়াই বৃষ্টির ব্যবস্থা। হোটেলে ফিরছি এমন সময় মুফতী সাহেব হুযূর দুপুরের খাবার হিসেবে 'খেবসা' (বাসমতি চাল সেদ্ধ করে হালকা মশলাযোগে তাওয়ায় টেলে নেয়া হলুদরঙা ভাত, সঙ্গে ভাজা বা পোড়া মুরগী) নিতে বললেন। আমরা খেবসার সন্ধানে মার্কেটে ঢুকতেই সদর দরজার উপরে দেখলাম স্বর্ণরঙা হরফে বাজারে প্রবেশের দু'আটি উৎকীর্ণ রয়েছে। হঠাৎ এক ইলেক্ট্রিক গ্রিলবেষ্টিত বন্ধ সাটারের সামনে মানুষের জটলা দেখে এগিয়ে গেলাম। মানসম্মত খাবার হোটেল এটা। ইলেক্ট্রিক সাটার খুলে যেতেই চোখে পড়লো খাবারের নানা আয়োজন। ভেতরে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। হোটেলের ডিসপ্লেতে মূল্যসহ খাবারের ছবি দেয়া আছে। মহিলা-পুরষের ভিন্ন লাইন। খাবার অর্ডার করা ও খাবার গ্রহণের ভিন্ন লাইন। প্রতিটি লাইন আবার সিলভার কালার স্টিল পাইপ দিয়ে আলাদা করা। সাত রিয়াল করে তিনটি খেবসা নিলাম। এক প্যাকেট খাবার সাধারণত দু'জন মানুষ খেতে পারে। মানসম্মত অভিনব হোটেলের নামটাও আকর্ষণীয় 'তাজায'। মুফতী সাহেব হুযূর বললেন, প্রতিদিন তাজা এবং মানসম্মত টাটকা সবজি ও মাছ-গোশত দিয়ে রান্না করাই হোটেলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাসি খাবার তারা কখনোই পরিবেশন করে না। এই তথ্য জানার পর খেবসার স্বাদ যেনো দ্বিগুণ বেড়ে গেলো।

সফরের ক্লান্তি ঝেড়ে তাওয়াফের প্রস্তুতি নিতে মাগরিব হয়ে এলো। মাগরিবের পরে মাতাফে প্রবেশের সময় বিশাল ফটক চোখে পড়ে। তিনটি ফটক দিয়ে মাতাফে প্রবেশ করা যায়। পূর্ববর্তী সৌদি বাদশাদের শাসনামলে নির্মিত তিনটি ফটকই সৌদি রাজবংশের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও তাদের দেহ এতোদিনে মাটির খোরাক হয়ে গেছে! আমরা বাবে মালিক আব্দুল আযীয দিয়ে প্রবেশ করলাম। অন্য দুটিতে বাদশাহ আব্দুল্লাহ আর মালিক ফাহাদের নাম পাথর খোদাই করে বড় অক্ষরে লিখা আছে। আমার সামনে কালো গিলাফে আচ্ছাদিত বরকতময় ঘর কাবা। ধনী-গরিব, পাপিষ্ঠ-দরবেশ, সাদা-কালো সব এক হয়ে সেই বরকতময় ঘর তওয়াফ করছে। 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বনিতে মুখর কাবার আঙিনা। সাদা ইহরাম ধারণ করা পবিত্র মানুষগুলো যেনো 'পুণ্য-নূরের' পরশে বেহেশতের ফেরেশতা হয়ে আজ ধরায় নেমে এসেছে। সকলেই ছুটে যাচ্ছেন কাবার দিকে। কালো গিলাফ ধরে যারযার হয়ে কাঁদছেন। হাজরে আসওয়াদকে ঘিরে বান্দাদের ব্যাকুলতা সত্যিই হৃদয়কে আকুল করে। কে জোয়ান আর কে বুড়ো সবাই যে পাগলপারা। মাওলা প্রেমের অনলে দগ্ধ

হৃদয়গুলো যেনো একটু রহম চায়। অদ্ভুত সুন্দর এই দৃশ্য। অবাক বিস্ময়ের এ সম্মিলন। নিঝুম পবিত্র রজনীর এ যে ধ্যানভাঙা ছবি। যে বুক ধারণ করেছে এই ছবি অদ্ভুত এক আকর্ষণে বারবার ছুটে গিয়েছে হেযাযের পথে, মাওলা পাকের একান্ত সান্নিধ্যে।
তাওয়াফ শেষ করতেই ইশার আযান পড়লো। মুফতী সাহেব হুযুর বললেন, মক্কা টাওয়ার রুকনে ইয়ামানী বরাবর নির্মিত হয়েছে। এখানে আসলে পড়তে হয়– রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌য়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ। মক্কা টাওয়ারকে যমযম টাওয়ারও বলা হয়।
হাজরে আসওয়াদ বরাবর নির্মিত সবুজ আলোয় উজ্জ্বল শ্বেত মিনারটিও হুযুর দেখিয়ে দিলেন। ইশার পরে সাফা-মারওয়া সায়ী করার জন্য মাতাফ থেকে বের হলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুন্দর ঝকঝকে শ্বেত পাথরের মেঝে পার হয়ে সাফায় যেতে হয়। সবুজ সাইনবোর্ডে বড় অক্ষরে সায়ী শুরু করার স্থানটি চিহ্নিত করে দেয়া আছে। চারপাশে কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে সাফা পাহাড়কে। সাফা-মারওয়ার মাঝামাঝি মূল জায়গাটুকু সবুজ আলো দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়েছে। মোটা স্পাতের পাইপে সংযুক্ত কালো সরু চতুর্ভুজ আকৃতির কাঠের মাঝে জ্বলতে থাকা সবুজ টিউব লাইটের সারি দেখে সহজেই একজন হাজী সাহেব সায়ী করার প্রস্তুতি নিতে পারেন। দৌড়ে পার হওয়ার অঘোষিত এক নিয়ম চালু হলেও মুফতী সাহেব হুযূর দ্রুত হেঁটে স্থানটি অতিক্রম করাকেই উত্তম বলেছেন। উমরা শেষ করে মিলিনিয়াম হোটেলের পশ্চিম দিকের গলি দিয়ে পাকিস্তানী সেলুনে হলক করতে গেলাম। এভাবেই আল্লাহর খাছ মেহেরবানীতে উমরার সকল কাজ সমাপ্ত হলো।
পরদিন গারে হেরা, গারে সাওরসহ বরকতময় স্থানগুলোর যিয়ারত নসীব হলো। ফিরে আসার সময় কারনুল মানাযিলে ইহরাম বেঁধে ২য় উমরার নিয়ত করে মক্কায় ফিরে এলাম। রাতে ২য় উমরার তওয়াফ শেষে হোটেলে ফিরে দেখি, মুফতী সাহেব হুযূর আর আমি ছাড়া কেউ হোটেলে ফিরেনি। অগত্যা হুযূরের মাথা এই প্রথম আনাড়ি হাতে আমিই হলক করে দিলাম। হুযূর সাহস দিলেন আর আমিও সাহসী হয়ে উঠলাম। আমার হলক নিয়ে দুশ্চিন্তা হলো। রাত ১২ টা। হলক করবো কোথায়? আবার হলক না করলে ইহরামও খোলা যাবে না। মুফতী সাহেব হুযূর আমার দুঃখ বুঝলেন। আমাকে অবাক করে হুযূর নিজেই আমার মাথা হলক করে দিলেন। হুযূর হলক করছেন আর আমার চোখটা পানিতে ভিজে যাচ্ছে। সোহবত লাভের আশায় মানুষ যার পদতলে নিজেকে সঁপে দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই তিনি যখন আমাদের সঙ্গে এমন করেন, তখনকার মনের অবস্থা আমরা মুখে ব্যক্ত করতে পারি না, আমাদের চোখগুলো তখন ছলছল করে ওঠে।
মক্কা ছেড়ে চলে আসার আগের দিন আমরা নফল তওয়াফের নিয়ত করলাম। মাগরিব নামাজ পড়েই উঠে এলাম বহুতল বিশিষ্ট মাতাফের তৃতীয় তলায়। মুফতী সাহেব হুযূর বললেন, মূল মাতাফে সাত চক্করে যে সময় লাগে, এখানে তার চেয়ে দশ মিনিট সময় বেশি লাগে।
এখন আমি আর বড়ভাই মাওলানা জুবায়ের আহমাদ ছাহেব হুযূরের সাথে তওয়াফে শরীক হয়েছি। অন্যরা বাদ ইশা তওয়াফ করবেন। সাত চক্কর শেষ করতেই ইশার আযান হলো। সেদিন আবার আকাশে এলো রমাযানের নতুন চাঁদ। তারাবীহর নামাযটাও শেষদিন মক্কায় পড়ার সৌভাগ্য হলো। নামায শেষে মুফতী সাহেব হুযূর চেয়ার নিয়ে বসলেন। ছাদের এ জায়গা থেকে কাবার উত্তরপাশ খুব সুন্দরভাবেই চোখে পড়ে। একে একে কাবা শরীফের সঙ্গে হুযূর আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। এতোদিন যে কাবাঘরকে দেখেছি দরসের পড়ায়, হুযূরের বলায় সেই কাবাকেই যেনো ভিন্নভাবে দেখছি। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনকে ঘিরে হাজী সাহেবানদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস চোখে পড়লো। চুম্বন শেষে এক হাজী সাহেব মানুষের কাঁধ ডিঙিয়ে আধমরা হয়ে মাতাফে ফিরলেন। মুফতী সাহেব হুযূর আমাদের বললেন, এভাবে নিজের জানকে হুমকির মুখে ফেলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা অনুচিত। দূর থেকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করলেই যথেষ্ট।
ঘণ্টাব্যাপী আমাদের একান্ত আলাপচারিতার পর্ব চললো। এ যে আল্লাহওয়ালাদের আল্লাহর পবিত্র ঘরের প্রতি অদ্ভুত এক আর্কষণের বহিঃপ্রকাশ তা বোধহয় না বললেও চলে। পুরোটা সময় হুযূর কাবার ইতিহাস, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কুরবানী, হজ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক ফরয বিধান পালনের প্রেক্ষাপটসহ হারামাইন শরীফাইনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করলেন। সেই স্মৃতিময় মধুর আলাপচারিতার একান্ত মুহূর্তগুলোতে আমাদের স্বভাবসুলভ শাগরেদের ভাবভঙিমা প্রকাশ পেলেও হুযূর গুরুগম্ভীর শিক্ষাগুরুর উচ্চাসন ছেড়ে পিতৃসম স্নেহ আর মমতাভরা আবেগ প্রকাশ করে আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন।
পরদিন সকালে মদীনার দিকে ছুটলাম। এ সেই মদীনা। রাসূলের কদম মুবারকে ধন্য এ মদীনার আকাশ ও যমীন। রাসূলের বরকতময় সৌরভে সুরভিত মদীনার আলো ও বাতাস। নববীপরশে ধন্য এখানের মাটি ও মানুষ। নজীরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করে আরবের কঠিন মরুবক্ষে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল আলোক মিনারের প্রথম স্থপতিও যে আমাদের পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কত কবি মদীনাকে নিয়ে লিখেছেন প্রেমকাব্য। কত অশ্রু নিভৃতে নিবেদিত হয়েছে রাসূলের সবুজ সমাধিতে। কত সাধকের সুদীর্ঘ সাধনার প্রেমফসল এই মদীনা। হঠাৎ মনে পড়লো দাদীর কথা। মদীনার সাদা তাসবীহ হাতে চোখভর্তি স্বপ্ন আর বুকভরা আশা নিয়ে কাঁদছেন আমার দাদী আর গুণগুণ করে আবৃত্তি করছেন–
'মদীনার মাটি মোর লাগিবে ভালো,
মদীনার বাতাস মোর লাগিবে ভালো,
আমায় নিয়া যাও গো মদীনা।'
আজকে দাদীকে খুব করে বলতে ইচ্ছে করছে, দাদী আমরা আপনার স্বপ্নের দেশে এসেছি। এতোদিন যাকে আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, লালন করেছেন বুকের গভীরে, দেখুন! আমরা সেই মদীনায় এসেছি! দাদী আজ কথা বলতে পারেন না। গুণগুণ করে মদীনার প্রতি প্রেম নিবেদন করেন না। মদীনার সেই সাদা তাসবীহ আমার অক্ষম দাদীর পবিত্র স্মৃতি হিসেবে আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের ছেড়ে তিনি বহুদিন আগেই আখেরাতে পাড়ি জামিয়েছেন।
আমরা এখন সেই মদীনার পথে। মদীনায় পৌঁছুতেই দুপুর হয়ে এলো। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হয়, মদীনায় পবিত্র রমাযানুল মোবারকের খোশ আমদেদ দিয়ে শুরু হলো আমাদের সফর। হোটেল মিললো বিকেলের দিকে। আসরের সময় মুফতী সাহেব হুযূরের সৌজন্য-সাক্ষাতে এলেন জামি'আর হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক প্রিয় উস্তায উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেব এবং জামি'আর কমিটির সদস্য কারী মুজাফফর সাহেবসহ অনেকেই। আমরা মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে মসজিদে নববীতে

হাজির হলাম। রোযাদারদের ইফতার করানোর সওয়াব প্রাপ্তির আশায় স্থানীয় লোকদের মেহমানদারীর যে বরকতময় দৃশ্য এখানে দেখেছি, আজো উমরার স্মৃতি মনে হলে সে দৃশ্য জ্বলজ্বল করে। এখানে যবরদস্তিমূলক সৌজন্য দেখিয়ে ভদ্রতা প্রকাশের পীড়াপীড়ি নেই। মেযবানগণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেহমানদের নিজের মুবারক দস্তরখানে শরীক হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। মেহমানগণও সানন্দে তাদের দাওয়াতকে গ্রহণ করছেন। এখানে সবাই সবার মেহমান। সকলেই সকলের মেযবান। আত্মীয়-স্বজনরাও আসছেন, অপরিচিত ভিনদেশী মানুষও বসছেন। কোন উচ্চবাচ্য নেই, নিজের ইফতার নিশ্চিত করারও তাগাদাও নেই। মেযবানদের আনন্দ আজ রোযাদারকে ইফতার করানোর। মেহমানের আনন্দ আজ নববী দস্তরখানে ইফতারের সৌভাগ্যের।

মাগরিবের নামায শেষ করেই হোটেলের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। পথে মুফতী সাহেব হুযূর রওযা শরীফে হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত দরজা বাবুস সালাম দেখিয়ে দিলেন। মসজিদে নববীর মূল অংশে প্রবেশের ফটকসংখ্যা এখন চল্লিশ ছাড়িয়েছে। মসজিদের পেছনেই রয়েছে জান্নাতুল বাকী কবরস্থান। এখানে বিখ্যাত সব সাহাবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের কবর দেয়া হয়েছে। আমরা মদীনার বিখ্যাত তায়বা হোটেলে অবস্থান করছিলাম। এখানেই পরিচিত মানুষজনেরা মুফতী সাহেব হুযূরের সাথে সৌজন্য-সাক্ষাতের জন্য আসতে থাকেন। মুফতী সাহেব হুযূরের শাগরেদ পরিচয়ে ফেনীর আব্দুল আযীয সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হলাম। স্থানীয় এক মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন । মাদরাসা বিষয়ে হুযূরের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলেন। এরই মধ্যে অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দ শহরীর ভাগ্নে। উর্দূভাষী। মসজিদে নববীতে পরিচালিত সবাহী হিফযখানায় বাচ্চাদের পড়া শোনেন। হুযূরের সঙ্গে তিনি তাবলীগের শূরায়ী নেযাম ও ইমারাতের বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যালোচনামূলক বৈঠক করলেন। সব আয়োজন শেষ করে শুতে গিয়ে দেখি ঘড়িতে সাড়ে ১২ টা।

পরদিন উহুদ, খন্দকসহ নববী স্মৃতিবিজড়িত বরকতময় স্থানগুলোর যিয়ারত নসীব হলো। এসব মহাপবিত্র স্থানগুলোর যিয়ারত করতে গিয়ে মুসলমানমাত্রই নবীপ্রেমে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। উহুদ প্রান্তরে শুহাদায়ে উহুদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের বিনয়াবনত নীরব অশ্রুপাত শক্ত কঠিন হৃদয়েও রহমতের শীতল বারিধারা বর্ষণ করে। শুহাদায়ে উহুদের মাকবারার তরে নিবেদিত যিয়ারতকারীগণের এ দু' ফোটা অশ্রু কি শহীদানের মাগফিরাত কামনায় শোকার্ত হৃদয়ের করুণ আর্তি, নাকি শহীদানের নজীরবিহীন গৌরবমাখা আত্মত্যাগের সামনে নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশের লজ্জিত উপস্থাপনা সেটা না হয় অব্যক্তই থাকুক। কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ওই তো উহুদ পর্বত। নবীপ্রেমে পাগলপারা সাহাবীগণের ত্যাগের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজো দাঁড়িয়ে সুবিশাল পর্বতটি। নবীজীর অসমান্য আত্মত্যাগের ঘটনাটিও যে পরম মমতায় লালন করে চলছে এ পর্বত। কতশত যিয়ারতকারীকে সে ঐ ঘটনা বলে চলছে। অনেক ঐতিহাসিক স্থান দর্শনার্থীদের ইতিহাস বলতে বলতে কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। কিন্তু উহুদ, নবীজীর রক্তস্নাত পর্বতটি আজও অবিচল ঠায় দাঁড়িয়ে। পবিত্র ইতিহাস ধারণ করেছে যে পাহাড়, বরকতময় অশ্রুতে শীতল হয়েছে যে রুক্ষ জমীন, রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদানে অবনত মস্তকে নববী দরবারে হাজিরা দিয়েছে যে বৃক্ষ। মিম্বরে উচ্চকিত উমরের নির্দেশনা সেনাকমান্ডারের কাছে পৌঁছে দিয়েছে যে বাতাস, সাহাবাদের ঘোড়ার স্পর্শ পেয়ে গর্দান বিছিয়ে দিয়েছে যে উত্তাল সমুদ্র, পবিত্র স্মৃতিগুলো বুকে ধারণ করে তাদেরকে যে বেঁচে থাকতে হবে বহুকাল।

পরদিন আমরা চলে এলাম জেদ্দায়। এখানে অবস্থানকারী বাংলাদেশী দীনী ভাইয়েরা মুফতী সাহেব হুযূরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে মাসজিদে বয়ানের জন্য জমায়েত হওয়া নিষিদ্ধ বিধায় স্থানীয়দেরকে ফ্ল্যাটের ভেতরে বিভিন্ন মাহফিলের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। মাঝারী সাইজের হলঘরে মুফতী সাহেব হুযূর সুন্নাত তরীকায় নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। ঘন্টাব্যাপি আলোচনায় নামায পড়ার সুন্নাত তরীকা, অবহেলায় নামাযে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ এবং নামায আদায়ে উদাসীনতা ও গাফলতি পরিহার করে সুন্নাত তরীকায় সহীহ-শুদ্ধ নামায পড়ার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে উঠে এলো। আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ করে হোটেলে ফিরতে রাত ১২টা বেজে গেলো।

চোখের পলকেই ফুরিয়ে গেলো উমরার দিনগুলো। ২২ই মে সন্ধ্যার ফ্লাইটে দেশের পথ ধরলাম। এই সফরে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক। আমরা আমাদের পরিচিত নগরীতে ফিরে এসেছি যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গের মুবারক সোহবতের তৃপ্তি নিয়ে। সফরের পৃষ্ঠাগুলো আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে আমাদের বুকে। ফেরার সময় শেষবারের মতো দেখে এসেছিলাম মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ, জান্নাতুল বাকী, সুবিশাল মসজিদে নববী আর মদীনার ফেরেশতাতুল্য মানুষ। 'এটাই যদি হয় আমার শেষ যিয়ারত' ভাবতেই চোখ ভিজে উঠল। রাব্বুল আলামীন কি বান্দার ফরিয়াদ কবুল করবেন! আবার তাওফীক দিবেন তার ঘরে আসবার!

লেখক পরিচিতি: শিক্ষার্থী, ইফতা প্রথম বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(৬ পৃষ্ঠার পর; বাতিলের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

(অর্থ:) যদি তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ-৭)

অর্থাৎ তিনি কাফেরদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিবেন। তাদের পরিকল্পনা তাদেরই ঘাড়ে এসে পড়বে। হ্যাঁ, আল্লাহ যদি আমাদের পক্ষে হয়ে যান, দুনিয়ার কোন পরাশক্তি আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ খোদা-দাবীদার ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন এবং সকল সংকট ও ষড়যন্ত্র হতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে
রক্ষা করেছেন। তেমনিভাবে আল্লাহ যুগের ফেরাউন আমেরিকা এবং তার মিত্রজোটকেও ধ্বংস করে ছাড়বেন। ওরা সবাই মিলে ২০ বছর ধরে যুদ্ধ করেও একটা দেশ দখলে রাখতে পারছে না। সব খুইয়ে এখন পালানোর পথ খুঁজছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। নিরাশ হওয়া তো শয়তানের কাজ। তো আমরা আমাদের ঈমান-আমল ঠিক করে নেবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপরে কায়েম থাকবো তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের সঙ্গে সর্বদা আল্লাহর মদদ ও নুছরাত থাকবে।

অনুলেখক: মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী
শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরবিয়া
খতীব, শাহীনবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ,
তেজগাঁও, ঢাকা।

সচ্চরিত্রতায় হযরত ফাতিমা রাযি.-এর অনুপম আদর্শ

মুফতী সালমান মনসূরপুরী দা.বা.

আজকাল ফিল্ম, মডেলিং, রাজনীতি, পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে চাকুরী, বিমানবালা (এয়ারহোস্টেস) ইত্যাদি লজ্জা-বিনষ্টকারী কর্মক্ষেত্রের প্রতি আধুনিকশিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের আগ্রহ বাড়ছে এবং দুনিয়াবী জাঁকজমক, সাজসজ্জা ও অর্থসম্পদের বিপরীতে সম্ভ্রম ও সতীত্ব, সচ্চরিত্রতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে গোটা সমাজ যৌন-বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের (মুসলিম) নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ও আইডল কি এই সম্ভ্রমহীন নারীরা, যারা আজ দুনিয়াকে পূতিগন্ধময় করে রেখেছে নাকি ঐ পবিত্রা ও সচ্চরিত্রা প্রখ্যাত মুসলিম মহীয়সী নারীগণ, যাঁরা চারিত্রিক পবিত্রতার বদৌলতে দুনিয়ায়ও অতুলনীয় সম্মান পেয়েছেন এবং আখেরাতেও সম্মানের মুকুট তাঁদেরই মাথায় থাকবে?

এই প্রেক্ষাপটেই নিচের কথাগুলো লেখা হয়েছে, যা নারীদের বিশেষত স্কুল-কলেজপড়ুয়া কিশোরী-যুবতী ছাত্রীদের কাছে পৌঁছানো জরুরী; ভালো হবে ঘরের মহিলাদের একত্রিত করে এই কথাগুলো শুনিয়ে দেয়া, যাতে তাদের মধ্যে লজ্জাহীন নারী ও মেয়েদের অনুকরণের পরিবর্তে খাতুনে-জান্নাত, নবীজীর কলিজার টুকরা, হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি.-এর জননী সাইয়িদাতুনা হযরত ফাতিমা যাহরা রাযি. ও তাঁর মতো পবিত্রা ও সম্মানিতা মহিলাদের পথে চলার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আশা করি, এই আবেদনের প্রতি মনযোগ দেয়া হবে।

হযরত ফাতিমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরমপ্রিয় আদরের কন্যা ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে একাধিকবার এ কথা বলেছেন যে, إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها অর্থাৎ ফাতিমা আমার অংশ; তাকে যা কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪৪৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরাচরিত অভ্যাস ছিলো, যখন তিনি সফর থেকে ফিরতেন তখন মসজিদে নামায আদায়ের পর সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, এরপর সম্মানিতা বিবিগণের সঙ্গে দেখা করতেন। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে যথারীতি হযরত ফাতিমা রাযি.-এর ঘরে গেলেন, তখন নবীদুহিতা হযরত ফাতিমা রাযি. ঘরের দরজায় নবীজীকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি প্রাণাধিক প্রিয় সম্মানিত পিতাকে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন; নবীজীর চেহারা মোবারক ও চক্ষুদ্বয়ে চুমু খেতে লাগলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেঁদে ফেললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কাঁদছো কেন?' হযরত ফাতিমা রাযি. উত্তর দিলেন– আপনাকে এলোমেলো চুলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখে (কাঁদছি)। আর আপনার জামাকাপড়ও পুরনো হয়ে গেছে (কেননা তখন সফর থেকে ফেরার কারণে নবীজীর পবিত্র শরীরে সফরের চিহ্ন দৃশ্যমান ছিলো, যা দেখে হযরত ফাতিমা রাযি.-এর মন আপ্লুত হয়েছিলো)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, বেটি! কেঁদো না। মূলত আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে একটি যিম্মাদারী দিয়ে পাঠিয়েছেন; তা হলো, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো কাঁচা-পাকা ঘর যেন অবশিষ্ট না থাকে, যেখানে দীন ইসলাম প্রবেশ করেনি; দীন যেন প্রত্যেক এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যতদূর রাত আসে (অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ পালনার্থেই সকল কষ্ট বরদাশত করছি; সুতরাং এতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই)। [হাশিয়া : নিসাউন ফী যিল্লি রাসূলিল্লাহ পৃ. ৩৩৬, তাবারানী ও আল-মুসতাদরাক লিল-হাকিম সূত্রে]

'খাতুনে জান্নাত'-এর মর্যাদা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল-পূর্ব অসুস্থতার সময় তাঁর সকল সম্মানিতা বিবিগণ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। এসময় হযরত ফাতিমা রাযি. হাঁটতে হাঁটতে সেখানে আসেন; তাঁর হাঁটাচলার ধরন অবিকল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে দেখলেন তখন এই বলে স্বাগত জানালেন– مرحبا بابنتي (আমার মেয়েকে স্বাগতম!) এবং তাঁকে নিজের ডানে বা বামে বসালেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রাযি.-কে কানে কানে কিছু বললেন, যা শুনে হযরত ফাতিমা রাযি. অনেক কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাকুলতা দেখে পুনরায় কানে কানে কিছু বললেন, যা শুনে হযরত ফাতিমা রাযি. হাসতে শুরু করলেন। (এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমার জীবনে আমি কাউকে দুঃখিত হওয়ার পর এত দ্রুত খুশি হতে দেখিনি। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ফাতিমা রাযি.-কে কাঁদতে দেখে আমি বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন, অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সম্মানিতা বিবিকে ছেড়ে আপনার সাথে কথা বলেছেন!) মজলিস শেষ হওয়ার পর আমি হযরত ফাতিমা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কানে কানে কী বলেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা প্রকাশ করবো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি হযরত ফাতিমা রাযি.-কে আমার আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন নবীজীর সাথে

সেদিনের কানাঘুষার ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই বলেন। তখন হযরত ফাতিমা রাযি. বললেন, হাঁ আমি এখন বলবো। এরপর তিনি বলা শুরু করলেন–

আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার কানে কানে বললেন, 'হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রতিবছর আমার সাথে একবার কুরআন শরীফের দাওর করতেন; এ বছর তিনি দু'বার দাওর করেছেন। এজন্য আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কাজেই তুমি সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে; কেননা আমি তোমার জন্য উত্তম পূর্বপুরুষ (অগ্রবর্তী)।' তখন আমি কেঁদে ফেললাম, যেমনটি আপনি সেদিন দেখেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাকুলতা দেখে পুনরায় আমার কানে কানে কথা বললেন। তিনি বললেন– 'তুমি কি এটা চাও না যে, তোমাকে সকল মুমিন নারীর বা এই উম্মতের নারীদের সরদার বানিয়ে দেওয়া হবে?' অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, তোমাকে জান্নাতী নারীদের সরদার বানিয়ে দেওয়া হবে? এটা শুনে আমি হেসে দিলাম, যেমনটা আপনি দেখেছেন। (সহীহ বুখারী হা.নং ৩৬২৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪৫০)

হযরত হুযায়ফা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাকে সালাম দেয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। এই ফেরেশতা ইতিপূর্বে কোনোদিন অবতরণ করেননি। তিনি এসে আমাকে এই সুসংবাদ শোনালেন যে, হযরত ফাতিমা রাযি. জান্নাতী মহিলাদের সর্দার হবেন।' (আল-মুসতাদরাক লিল-হাকিম; হা.নং ৪৭২২, নিসাউন ফি যিল্লি রাসূলিল্লাহ-এর সূত্রে, পৃ. ৩৩৪)

হযরত ফাতিমা রাযি. জান্নাতী নারীদের সর্দার হওয়ার মর্যাদা শুধু এ কারণে লাভ করেননি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ছিলেন এবং এজন্যও নয় যে, তিনি রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন; বরং তাঁর এই অভাবিত মর্যাদার মূল রহস্য ও প্রকৃত কারণ হলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার ব্যবহারিক নমুনা তিনি পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। যদি তাঁর মধ্যে এই অনন্য বৈশিষ্ট্য না থাকতো তাহলে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রক্তের সম্পর্ক বা তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য জান্নাতী নারীদের সর্দার হওয়ার মর্যাদালাভে যথেষ্ট হতো না।

চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় হযরত ফাতিমা রাযি.-এর দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষ মনে করে, শ্রেষ্ঠ নারী হলো সে, যে অসামান্য রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়, সাজসজ্জা ও মেকআপে অনন্যা হয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, মার্কেটে বা শপিংমলে এবং মেলা বা উৎসবে যেতে তার কোনো সংকোচ হয় না। এমন নারীদেরই আজ পছন্দের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং এসব বিষয়ে নারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাযি.-এর মনোভাব কী ছিলো, তা নিম্নবর্ণিত ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়।

হযরত আলী রাযি. বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এ আলোচনা হচ্ছিলো যে, মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গুণ কী? মজলিসের সকলে নিরুত্তর রইলেন। মজলিসের পরে হযরত আলী রাযি. ঘরে গেলেন এবং হযরত ফাতিমা রাযি.-কে জানালেন যে, আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এ আলোচনা চলছিলো যে, মেয়েদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? এ ব্যাপারে আপনার মত কী? হযরত ফাতিমা রাযি. বললেন, মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গুণ হলো– তারা কোনো পরপুরুষকে দেখবে না আর কোনো পরপুরুষের দৃষ্টি তাদের উপর পড়বে না। হযরত আলী রাযি. এই কথাগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে শোনালেন। নবীজী তা সত্যায়ন করলেন এবং বললেন, ফাতিমা (রাযি.) তো আমারই অংশ (অর্থাৎ সে শরীয়তের যথার্থ ব্যাখ্যাই করেছে)।

ঘরের কাজকর্মের ব্যাপারে হযরত ফাতিমা রাযি.-এর কর্মপদ্ধতি

হযরত ফাতিমা রাযি.-এর রোখসতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গৃহস্থালি কাজকর্মের' কিছু আসবাবপত্রের (চামড়ার গদি, মশক, মটকা এবং চাক্কি ইত্যাদি) ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হযরত ফাতিমা রাযি. নিজ হাতেই চাক্কিতে আটা পিষতেন, আটার খামির করতেন, রুটি সেঁকতেন এবং ঘরের অন্যান্য কাজকর্মও নিজেই করতেন, যে কারণে তাঁর হাতে দাগ বসে গিয়েছিলো। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁকে একজন খাদেম দেওয়ার আবেদন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় মেয়েকে খাদেম দেওয়ার পরিবর্তে একটি বিশেষ তাসবীহ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যাকে 'তাসবীহে ফাতেমী' বলা হয়।

হযরত আলী রাযি. বলেন, আহলে-বাইতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ছিলেন হযরত ফাতিমা রাযি., যিনি আমার বিবাহবন্ধনে ছিলেন। নিয়মিত চাক্কিতে আটা পেষার কারণে তাঁর হাতে দাগ বসে গিয়েছিলো, চামড়ার মশক থেকে পানি বের করার কারণে তাঁর বুকে দাগ পড়ে গিয়েছিলো, ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের কারণে তাঁর কাপড়চোপড় ধুলোমলিন ও মেটে-বর্ণ ধারণ করেছিলো, চুলায় খাবার রান্না করার কারণে তাঁর কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মোটকথা, তাঁর উপর গৃহস্থালী কাজকর্মের বড় বোঝা ছিলো। একবার আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোলাম-বাঁদী এসেছে। তখন আমি হযরত ফাতিমা রাযি.-কে উৎসাহ দিলাম, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একজন খাদেম দেওয়ার আবেদন করেন, যে তার কাজকর্মের সহযোগী হবে। তখন হযরত ফাতিমা রাযি. এই উদ্দেশ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানে আরো কিছু মানুষ বসে থাকায় হযরত ফাতিমা

রাযি. লজ্জাবশত ফিরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, তিনি এসেছিলেন এবং ফিরে গেছেন তখন তিনি নিজেই বিকেলের দিকে হযরত ফাতিমা রাযি.-এর ঘরে হাজির হলেন। তখন হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী রাযি. উভয়ে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রাযি.-এর শিয়রের কাছে বসলেন। হযরত ফাতিমা রাযি. লজ্জায় নিজের মুখ চাদর দিয়ে ঢাকলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি আমাদের ঘরে কী প্রয়োজনে এসেছিলে?' দু'বার জিজ্ঞেস করার পরে-ও যখন হযরত ফাতিমা রাযি. জবাব দিলেন না তখন আমি (হযরত আলী রাযি.) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলছি। বিষয়টি হলো, চাক্কি চালানোর কারণে এবং মশক থেকে পানি নেওয়ার কারণে তার শরীরে দাগ পড়ে গেছে, ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চুলা জ্বালানোর কারণে কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা জেনেছি যে, আপনার কাছে কিছু খাদেম এসেছে; তখন আমিই তাকে উৎসাহ দিয়েছি, তিনি যেন আপনার কাছে গিয়ে খাদেমের জন্য আবেদন করেন। এজন্য তিনি আপনার কাছে গিয়েছিলেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি কি তোমাদের আবেদনকৃত বস্তুর চেয়ে উত্তম বস্তুর কথা তোমাদের বলে দিবো না? যখন তোমরা ঘুমানোর জন্য বিছানায় শয়ন করো তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিবে। এটা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম হবে।' (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৫০৬২, ৫০৬৩)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তারা খাদেম চাওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'কসম আল্লাহর! এটা হতে পারে না যে, আমি তোমাদেরকে খাদেম দিয়ে দিবো আর সুফফায় অবস্থানরত দরিদ্র সাহাবায়ে কেরাম রাযি. অভুক্ত পড়ে থাকবেন। আমি এই গোলামগুলোকে বিক্রয় করে এগুলোর বিক্রয়মূল্য আসহাবে-সুফফার পেছনে ব্যয় করবো।' এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাসবীহাত পড়ার হুকুম দিলেন, যেমনটা উপরে বিবৃত হয়েছে। (নিসাউন ফি যিল্লি রাসূলিল্লাহ, পৃ. ২৩)

দেখুন! এই ছিলো সেই মহীয়সী নারীর জীবনপদ্ধতি, যিনি দো-জাহানের সরদার হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম কন্যা ছিলেন এবং দুনিয়াতেই 'খাতুনে জান্নাত' হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন। অপরদিকে আজকের আধুনিক নারীদের অবস্থা হলো, গৃহস্থালি কাজকর্মের' পরিবর্তে ঘরের বাইরের কাজকর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষত স্কুল-কলেজপড়ুয়া মেয়েরা এই চিন্তাচেতনা নিয়ে গড়ে উঠছে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র ঘর নয়; বরং বাইরের সমগ্র পৃথিবী; তারা খেলার মাঠে আগে বাড়বে, নৃত্যকলা-গানবাদ্য (যাকে 'চারুকলা'র চটকদার নাম দেয়া হয়েছে) শিখে পাপাচারীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে, না স্বামীর আনুগত্যের চিন্তা থাকবে আর না বাচ্চাদের তরবিয়তের অনুভূতি থাকবে; যাতে পৃথিবী থেকে সামাজিক পরিবারব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পশ্চিমা নারীরা যেমন পাপাচারের নাপাক পানিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সমগ্র বিশ্বে যেন এমন অশ্লীলতার পরিবেশ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আজ এই পর্দাহীনতা বরং অসভ্যতাকে সম্মানের মাপকাঠি বানিয়ে নেয়া হয়েছে আর পর্দা-পুশিদাকে সেকেলে ও প্রগতিশীলতার অন্তরায় বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় সকলের কিছু করা উচিত এবং কিছু বোঝা উচিত। একজন মুসলিম নারীর এ কথা বোঝা জরুরী যে, এই অন্তঃসারশূন্য স্বাধীনতায় কখনোই মর্যাদা ও নিরাপত্তা অর্জিত হবে না; বরং মুসলিম নারীর প্রকৃত সম্মান সেসকল আচারব্যবহার, চালচলন, সতীত্বরক্ষা ও পবিত্রতায়ই অর্জিত হবে, যা অবলম্বন করে হযরত ফাতিমা রাযি. অনন্য সম্মান লাভ করেছেন, মহীয়সী নবী-পত্নীগণ মহত্ত্বের মর্যাদা পেয়েছেন এবং সম্মানিতা সাহাবিয়াগণের নাম দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল হয়েছে। কেবলমাত্র এই পূতপবিত্র জীবনাচারই নারীর সম্মানের কারণ; এছাড়া অন্য কোনো পথে নারীর সম্মান অর্জিত হয়নি, হতে পারে না।

চূড়ান্ত পর্যায়ের সচ্চরিত্রতা

'খাতুনে জান্নাত' নবীজীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা রাযি.-এর সচ্চরিত্রতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার কিছুটা এ ঘটনা থেকেও আন্দাজ করা যায় যে, যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন এবং বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর শুশ্রূষাকারিণী (হযরত আবূ বকর রাযি.-এর স্ত্রী) হযরত আসমা বিনতে উমায়স রাযি.-কে অত্যন্ত আক্ষেপভরা কণ্ঠে বলছিলেন– 'যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমার মরদেহ উন্মুক্ত অবস্থায় খাটিয়ায় রেখে নিয়ে যাওয়া হবে (এবং আমার কাফনের উপর বেগানা পুরুষের দৃষ্টি পড়বে), এসব কথা চিন্তা করে আমার লজ্জা লাগছে।' এ কথা শুনে হযরত আসমা রাযি. বললেন, আমি আপনাকে এমন জানাযা বানিয়ে দেখাবো, যা হাবশা অঞ্চলে মহিলাদের জন্য বানানো হয়। হযরত ফাতিমা রাযি. তাকে দেখাতে বললেন। তখন হযরত আসমা রাযি. কয়েকটি তাজা ডাল আনালেন এবং সেগুলোকে লাঠি বানিয়ে খাটিয়ার উপর এমনভাবে দাঁড় করালেন যে, সেগুলোর উপরে চাদর টানিয়ে দিলে ভিতরে মরদেহের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। হযরত ফাতিমা রাযি. এমন জানাযার পদ্ধতি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন এবং মুচকি হেসে নিজের খুশিরও জানান দিলেন, অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর থেকে তাঁকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি। হযরত ফাতিমা রাযি.-এর ইন্তেকালের পর এমন পদ্ধতিরই জানাযা বানানো হয়েছিলো এবং রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো। رضي الله عنها وأرضاها (নিসাউন ফি যিল্লি রাসূলিল্লাহ, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)

এমনই ছিলো তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা। মৃত্যুর পর বেগানা পুরুষদের দৃষ্টি পড়ার চিন্তায় লজ্জা পাচ্ছেন। অপরদিকে আজকের নির্লজ্জ নারীদের অবস্থা হলো, পর্দাহীনতা ও নগ্নতায় তাদের মোটেও লজ্জা অনুভব হয় না; বরং পারিপার্শ্বিক

কারণে শরীরকে পোশাকের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। এই স্বাধীনচেতা মনোভাবকে আজ উন্নতি ও প্রগতির মাপকাঠি মনে করা হয়; অথচ এই পোশাকহীনতা নারীর জন্য সম্মান নয়, বরং নিকৃষ্টতম অপমানকর। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমকের কারণে এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির কুচক্রীদের প-্যানিংয়ে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে, নির্বোধ নারীরা নিজেদের অপমানকেই সম্মান মনে করে নিয়েছে এবং পর্দা, যা প্রকৃতিগতভাবেই তার নিরাপত্তার রক্ষাকবচ ছিলো তাকেই নিজের জন্য বোঝা মনে করছে।

লজ্জায় ডুবে মরি!

কয়েকদিন পূর্বে অধম (লেখক) ট্রেনে করে দিল্লী থেকে মুরাদাবাদ আসছিলাম। আমার কাছাকাছি আসনে একজন অমুসলিম যুবক বসেছিলো। সে কথার এক পর্যায়ে একজন টেনিস খেলোয়াড় মুসলিম মেয়ে (যার নাম উচ্চারণ করাও ভদ্র মানুষের জন্য লজ্জাকর) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তার ব্যাপারে আপনার কী মত? আমি বললাম যে, যদি আপনার ঘরের কোনো নারী এভাবে অর্ধনগ্ন হয়ে মানুষের সামনে আসে তাহলে আপনার কেমন লাগবে? সে বললো, আমার তো অবশ্যই খারাপ লাগবে। আমি বললাম, ইসলামও এটাই বলে যে, কোনো নারীর জন্যই এরকম নির্লজ্জতা বৈধ নয়। এ কথা শুনে সে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ও সময়ের কুখ্যাত এক চিত্রনায়িকার নাম নিয়ে বিদ্রুপের সুরে বলতে লাগলো, আপনি ইসলামের নাম নিচ্ছেন আর এই পাকিস্তানী নায়িকা ভারতীয় চলচ্চিত্রে এসে এমন উন্মুক্ত দৃশ্যে অভিনয় করেছে যে, অতীতের নগ্নতার সকল রেকর্ড ভেঙে গেছে। আমি বললাম, খারাপ তো সর্বদাই খারাপ। ভারতীয়, পাকিস্তানী বা অন্য যে কোনো দেশের মানুষ ভুল করবে তাকে সর্বাবস্থায় ভুলই বলতে হবে। তাছাড়া পাকিস্তান কোনো ইসলামের প্রতিনিধিত্বশীল দেশ নয় যে, সেখানকার কোনো পাপাচারিণী পাপিষ্ঠা নায়িকার কাজকর্মকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। আর নির্লজ্জ নর-নারী যেমন ভারতে আছে তেমনই পাকিস্তানেও আছে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের সকল কাজের বিরুদ্ধে এবং এর তীব্র নিন্দা করে।

আমি তাকে উত্তর দিয়ে নিরুত্তর তো করে দিলাম; কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই আত্মমর্যাদা-বোধহীন ও নির্লজ্জ নারীরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে কালিমা লেপন করেছে এবং ইসলামের পবিত্র শিক্ষাগুলোকে বিধর্মীদের দৃষ্টিতে ধূলিধূসরিত করে দিয়েছে। এই চিত্রনায়িকা ও খেলার মাঠে লম্ফঝম্ফকারিণী নারীরা নিঃসন্দেহে ঐ হাদীসেরই সত্যায়ন, যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, উম্মতের মধ্যে এমন নারীরা প্রকাশ পাবে, যারা পোশাক পরেও নগ্ন থাকবে এবং নিজে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট ও পরপুরুষকে আকর্ষণকারিণী হবে। এমন নারীরা জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের সুবাস থেকেও বঞ্চিত থাকবে; অথচ জান্নাতের সুবাস বহুদূর থেকেও পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১২৮)

আমাদের নারীদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কার অনুসরণে চলবে? ফ্যাশনেবল ও আত্মমর্যাদা-বোধহীন আধুনিক নারীদের পথে, যা জাহান্নামে পৌঁছে দিবে নাকি ঐসকল পবিত্রা নারীদের অনুসরণ করবে, যাদের আদর্শের অনুসরণই জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা? যদি আমাদের মধ্যে দীন ও ঈমানের ছিঁটেফোঁটাও অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই লজ্জাহীন নারীদের পরিবর্তে সম্মানিতা নবীপত্নীগণকে ও সাহাবিয়াদেরকে নিজেদের অনুকরণীয় আদর্শ ও আইডল বানানো উচিত এবং চারিত্রিক শুদ্ধতা ও সচ্চরিত্রতা এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার জীবন যাপন করা উচিত। বিশেষত মেয়েদের মন-মানসিকতা এভাবে গড়ে তোলা উচিত যে, তাদের মধ্যে ফ্যাশন-সচেতনতা এবং সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্যের বিপরীতে পারলৌকিক কামিয়াবী অর্জনের জযবা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয় এবং চারিত্রিক পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতার গুরুত্ব তাদের মন-মস্তিষ্কে গেঁথে যায়।

ঘরের নারীদের নির্লজ্জ কার্যকলাপে নীরবতা অবলম্বনকারী মাল'ঊন, অভিশপ্ত!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ধরনের লোক জান্নাতে যাবে না–

১. এমন পুরুষ, যে নারীদের মতো পোশাক পরিধান করে।

২. এমন নারী, যে পুরুষদের মতো পোশাক পরিধান করে।

৩. দাইয়ূস ব্যক্তি (অর্থাৎ যে নিজ পরিবারের মানুষের নির্লজ্জ কার্যকলাপ দেখেও নীরব থাকে)। (শু'আবুল ঈমান ৭/১৬৭)

আফসোস! আজ মেয়েদের, স্ত্রীদের এবং বোনদের নির্লজ্জতায় শুধু নীরবতাই নয়; বরং এই নগ্নতাকে নাঊযুবিল্লাহ গর্বের বিষয় মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত ঐ নারী টেনিস-খেলোয়াড় যখন খেলার মাঠে সাফল্য পেতে শুরু করে তখন তার মাতাপিতা সাংবাদিকদের সামনে খোলাখুলিভাবে মেয়ের সাফল্যে সীমাহীন খুশি প্রকাশ করেছে। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এমন মাতাপিতা, যারা নিজ মেয়ের নগ্নতায় সন্তুষ্ট থাকে তারা সম্মানের পাত্র নয়; বরং তারা 'দাইয়ূস' আখ্যায়িত হওয়ার উপযুক্ত, হাদীস শরীফে যাদের উপর লা'নতের কথা এসেছে। এটা খুশির নয়; বরং লজ্জায় ডুবে মরার জায়গা যে, মুসলিম মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে মেয়েরা নগ্নতার প্রদর্শনী করছে এবং মুসলিম মাতাপিতা তাতে অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাদেরকে খোলাখুলিভাবে সাধুবাদ দিচ্ছে। এটা ইসলামের তরীকা নয়; বরং শয়তান-পূজারীদের তরীকা, যা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা জরুরী। নিঃসন্দেহে মেয়েদের শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষিত বানানোর প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু যদি তাদের এমন শিক্ষা ও আদর্শ দেয়া হয়, যাতে তাদের নারীত্ব ও সতীত্ব কলঙ্কিত হয় তাহলে সেটা শিক্ষা নয়; বরং চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা; কোনো সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন মানুষ কোনোভাবেই এই নগ্নতা ও নির্লজ্জতার সমর্থন করতে পারে না। কাজেই আমাদের মা-বোনদের সর্বদা হযরত ফাতিমা রাযি.-এর আদর্শ সামনে রাখা উচিত এবং তাঁরই অনুকরণের চেষ্টা করা উচিত। এখানেই নিহিত আছে তাদের সম্মান, এবং এখানেই তারা পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা পেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা ও তার সকল উপায়-উপকরণকে ঘৃণা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ: মাওলানা সা'দ আরাফাত
শিক্ষক: জামি'আ ইসলামিয়া চর ওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা

অধীনস্তদের প্রতি সদাচরণ

মাওলানা মুহাম্মদ আশিক ইলাহী

ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও সর্বপ্রকার পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত এসব মৌলিক ইবাদতে ইসলামকে সীমাবদ্ধ মনে করে জীবনের অবশিষ্ট ধাপগুলো মনের খায়েশ মতো অতিক্রম করা ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ, জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর পর কবর অবধি মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় পরিবেষ্টিত।

অধীনস্তদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া এবং তাদের সঙ্গে সদাচরণের ক্ষেত্রে নববী আদর্শ আমাদের অনেক দীনদার শ্রেণীর মাঝেও অনুপস্থিত। চাকর-বাকরদের অল্প-স্বল্প অপরাধ মার্জনা করার তাওফীকও আমাদের হয় না। কারণে-অকারণে গালাগালি না করে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি না। পারলে হুটহাট চড়-থাপ্পড় দিতেও দ্বিধা করি না। শাস্তির মাত্রা অপরাধকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিনা এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার যেনো সময়ই নেই। অথচ কুরআন ও হাদীসে অধীনস্তদের অপরাধ মার্জনা করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রিয় সাহাবীগণসহ পরবর্তী মনীষীদের জীবন-আর্দশ থেকেও বিষয়টি প্রতীয়মান হয়–

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة، قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة

(অর্থ:) জনৈক সাহাবী নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কতোবার খাদেমকে ক্ষমা করবো? নবীজী কিছু না বলে চুপ থাকলেন। সাহাবী আবারও একই কথা বললেন। এবারও নবীজী কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার যখন তিনি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন তখন নবীজী বললেন, দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৫১৬৪)

হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. তাঁর অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাযলুল মাজহুদ-এ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একজন খাদেম (ক্রীতদাস) স্বভাবতই দিনে সত্তরবার মালিকের অবাধ্যতা করবে না। সুতরাং দিনে সত্তরবার ক্ষমা করার অর্থ হলো, তার সকল পদস্খলন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। (বাযলুল মাজহুদ ১৩/৫৫১)

নবীজীর জীবন-আদর্শ থেকে শিক্ষা

মানবতার আদর্শ শিক্ষক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত জীবনেও তার এ বাণীর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন–

حدثنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت

(অর্থ:) হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছর খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে নবীজী আমার কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উফ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি এবং এভাবেও কখনো বলেননি যে, এটা কেন করলে, ওটা কেন করলে না? (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬০৩৮)

আরেক দিনের ঘটনা। হযরত আনাস রাযি. বলেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت: نعم، أنا أذهب، يا رسول الله

(অর্থ:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চরিত্র-মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি কোন প্রয়োজনে আমাকে বাইরে পাঠালে আমি বললাম, আমি কোনভাবেই যাচ্ছি না! কিন্তু যেহেতু নবীজী আদেশ করেছেন, তাই মনে মনে ঠিকই যাওয়ার সংকল্প ছিল। সুতরাং আমি বের হলাম। যাওয়ার পথে দেখি, কয়েকটি শিশুকে বাজারে খেলাধূলা করছে। ব্যস, আমি খেলা দেখায় মগ্ন হয়ে গেলাম (এবং গন্তব্যে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম)। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ পেছন দিক থেকে এসে আমার ঘাড় ধরে ফেললেন। আমি ঘুরে তার দিকে তাকালে তিনি হেসে দিয়ে বললেন; প্রিয় আনাস! তোমাকে যেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম, গিয়েছিলে তো? বললাম, জ্বি, জ্বী, এখনই যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসূল! (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩১০)

সাহাবীদের কেউ এ বিষয়ে কিছুটা শিথিলতার আচরণ করলে নবীজী কঠোরতার সঙ্গে তাদেরকে সর্তক করতেন

عن المعرور بن سويد، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

(অর্থ:) হযরত মা'রূর বিন সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রবাযা নামক স্থানে হযরত আবূ যর রাযি.-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। দেখতে পেলাম, তার গায়ে এক জোড়া কাপড় এবং তার গোলামও একই মানের এক জোড়া কাপড় পরিহিত। (এতে আমি আশ্চর্যবোধ করলাম। কারণ, মালিকের জামা গোলামের জামার চেয়ে উন্নতমানের হয়ে থাকে। উভয়ে একই মানের কাপড় পরার প্রচলন সমাজে নেই। সুতরাং) আমি এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, একবার আমি একলোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে তার মাকে নিয়ে কটুকথা বলে ফেলেছিলাম। তখন নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আবূ যর! তুমি তার মাকে নিয়ে কটুকথা বললে? তোমার মধ্যে তো দেখি এখনো জাহেলিয়্যাতের অন্ধকারের প্রভাব রয়ে গেছে! তোমাদের গোলামরা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত বানিয়েছেন। কারও অধীনে যদি তার কোনো ভাই (গোলাম) থাকে, তাহলে সে যা খায়, তার ভাইকে যেনো তা-ই খাওয়ায় এবং সে যা পরে, সে ধরণের

কাপড় যেন তাকে পরায়। তোমরা সাধ্যের বাইরে তাদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ো না। তোমরা তাদেরকে কোন দায়িত্ব দিলে (যথাসম্ভব) তাদের সহযোগিতা করবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩০)

নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরও সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ আলোকিত আর্দশ নিজেদের বাস্তবজীবনে সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন। বিশেষত কুরআনের এ বাণী–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(অর্থ:) তুমি বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতার নীতি গ্রহণ করো এবং লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদের এড়িয়ে চল। (সূরা আ'রাফ-১৯৯)– শ্রবণ করতেই তারা নিজেদের রাগে পানি ঢেলে দিতেন এবং মুহূর্তেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতেন। হাদীসের এসেছে–

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: «فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله

(অর্থ:) উয়াইনা ইবনে হিছ্ন ইবনে হুযাইফা (মদীনায় এসে) তার ভাতিজা হুর ইবনে কাইসের মেহমান হলেন, যিনি হযরত উমর রাযি.-এর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। আর কুরআনের জ্ঞান রাখেন এবং আলেম এমন লোকেরাই হযরত উমর রাযি.-এর মজলিসের সাথী এবং তার পরামর্শদাতা ছিলেন; চাই তিনি বয়সে ছোট হোন কিংবা বড়। উয়াইনা তার ভাতিজাকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের নিকট তো তোমার বিশেষ মূল্যায়ন আছে, তার সঙ্গে সাক্ষাত-বিষয়ে আমার জন্য অনুমতি চাও। হুর বিন কায়স বললেন, অবশ্যই আমি অনুমতি চাইব। হুর অনুমতি চাইলে হযরত উমর রাযি. অনুমতি দিলেন। উয়াইনা উমর রাযি.-এর নিকট প্রবেশ করে বলেন, হে খাত্তাবের বেটা! তুমি তো আমাদেরকে ভালোভাবে দান করো না, আমাদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করো না। (এ সব অযাচিত, অনুচিত ও বাস্তবতা বিরোধী কথা শুনে স্বভাবতই) হযরত উমর রাযি. রাগান্বিত হয়ে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখনই হুর বলে উঠলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(অর্থ:) তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ করো এবং লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (সূরা আ'রাফ-১৯৯) আর আমার চাচাও তো একজন মূর্খ মানুষ! এই হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! হুরের এই কথা শুনতেই হযরত উমর রাযি. আর আগে বাড়লেন না। তিনি আল্লাহর কিতাবের সামনে সর্বদা নতশির থাকতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৬৪২)

একটু ভাবি, অর্ধপৃথিবীর বাদশাহ হয়েও তিনি কুরআনের সামনে মাথা নত করেছেন, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমার আচরণ করেছেন। আমরা কি এভাবে পরতে-পরতে কুরআনী আদর্শে জীবনকে মধুময় করে তুলতে পারি না?

এ প্রসঙ্গে হিল্য়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে হযরত আমীরে মু'আবিয়া রাযি. সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ রয়েছে–

হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি. কোন বিশেষ কারণে দুই-তিন মাস দান করা বন্ধ রাখলেন। এ সময় একবার তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন আবূ মুসলিম নামক একব্যক্তি বলল, হে মুআবিয়া! এই ধন-সম্পদ তোমার নয়, তোমার বাপেরও নয়, তোমার মায়েরও নয়! এ কথা শুনে মুআবিয়া রাযি. ইশারায় লোকজনকে বসতে বলে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। গোসল করে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, হে লোকসকল! আবূ মুসলিম বলেছে এই অর্থ-সম্পদ আমার নয়, আমার বাপ এবং মায়েরও নয়। আবূ মুসলিম সত্য বলেছে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل

অর্থ: ক্রোধ শয়তানের থেকে সৃষ্ট। শয়তান আগুন থেকে। আর পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হলে সে যেন গোসল করে নেয়। আল্লাহর বরকতের উপর ভরসা করে আগামীকাল তোমরা তোমাদের দান নিয়ে যাবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ও তবকাতুল আসফিয়া ২/৩১১; দারুল ফিকর)

সাহাবায়ে কেরামের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরনের চেষ্টা করেছেন বলেই তো তাদের পরবর্তীরা 'তাবিয়ীন' নামে ভূষিত হয়েছেন। তাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা ও অধীনস্তদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার শিক্ষা তাদের জীবনেও সমুজ্জ্বল ছিল

খুলাফায়ে রাশেদীনদের দলভুক্ত উমরে সানী, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. একদিন একলোকের উপর ভীষণ রাগান্বিত হলেন। আদেশ করা হলে তাকে উপস্থিত করা হলো। তার (উপরের) পোশাক খুলে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। চাবুকও নিয়ে আসা হলো। এখন কেবল আদেশের অপেক্ষা। তখনি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আমি ক্রোধান্বিত না হতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিতাম। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس

(অর্থ:) মুত্তাকীরা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। (সূরা আলে-ইমরান-১৩৪, উমর ইবনে আব্দুল আযীয মা'আলিমুত তাজদীদ ওয়াল ইসলাহ আর-রাশিদী আলা মিনহাজিন নুবুওওয়া; পৃষ্ঠা ৮২)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেউ ক্রোধ সংবরণ করতে পেরেছে এটা কখন বলা যাবে? যে ক্ষেত্রে সে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম, সেখানেও কি এ বাক্য প্রয়োগযোগ্য? বিখ্যাত মুফাসসির হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ব্যাখ্যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ يُرِيدُ الرَّجُل يَتَنَاوَلُكَ بِلِسَانِهِ وَأَنْتَ تَقْدِرُ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ فَتَكْظِمَ غَيْظَكَ عَنْهُ، فَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا

(অর্থ:) ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন ব্যক্তি তোমাকে কটু কথা বলে কষ্ট দিয়েছে, প্রতিউত্তরে তোমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পাল্টা পদক্ষেপ না নিয়ে ক্রোধ সংবরণ করা। (মাকারিমুল আখলাক লিত-তাবারানী; হা.নং ৫৪)

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমার নীতি অবলম্বনের হাদীসে বর্ণিত ফযীলত

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

من كظم غيظه، وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رءوس الخلائق، حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء،

(অর্থ:) প্রতিশোধ গ্রহণের সক্ষমতা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে,

আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন) সমস্ত মানুষের সামনে তার চাহিদামতো একজন ডাগর চোখবিশিষ্ট (জান্নাতী) হুর গ্রহণের অধিকার দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৫৬১৯)

হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হযরত হুসাইন রাযি.-এর সুযোগ্য পুত্র আলী বিন হুসাইন। আবেদদের গর্ব-গৌরব বলে তিনি যাইনুল আবেদীন নামে পরিচিত। শাসক না হয়েও তিনি প্রজাদের হৃদয়রাজ্য জয় করেছিলেন। ইমাম বাইহাকী রহ. তার শু'আবুল ঈমান নামক কিতাবে হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.-এর একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন–

يقول: جعلت جارية لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء، فتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ، فقال لها: قد كظمت غيظي، قالت: والعافين عن الناس، فقال لها: قد عفا الله عنك، قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة

(অর্থ:) হযরত আলী ইবনুল হুসাইন নামাযের প্রস্তুতি নিতে উযূ করতে বসলেন। তার বাঁদী পানি ঢেলে দিচ্ছিল। হঠাৎ বাঁদীর হাত ফসকে পাত্রটি তাঁর চেহারায় পড়ল। আঘাতের চোটে তার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো। আলী ইবনুল হুসাইন মাথা তুলে বাঁদীর দিকে তাকালেন। তখন বাঁদী বলল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, والكاظمين الغيظ (মুত্তাকীরা ক্রোধ সংবরণ করে।) হযরত আলী ইবনুল হুসাইন তাকে বললেন, আমি ক্রোধ সংবরণ করেছি। বাঁদী বলল, والعافين عن الناس (মুত্তাকীরা মানুষকে ক্ষমা করে।) হযরত বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এরপর বাঁদী পড়ল, والله يحب المحسنين (আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।) তখন হযরত বললেন, যাও, আমি তোমাকে স্বাধীন করে দিলাম। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৭৯৬৪)

জাহেলী যুগে সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার মূল্যায়ন

জাহেলিয়্যাতের বর্বর যুগেও সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার বিশেষ মূল্যায়ন ছিল। এই গুণের অধিকারী না হলে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার কল্পনা করাও আপরাধ ছিল। আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُسَوِّدُونَ إِلَّا مَنْ كَانَتْ فِيهِ سِتُّ خِصَالٍ وَتَمَامُهَا فِي الْإِسْلَامِ سَابِعَةٌ: السَّخَاءُ وَالنَّجْدَةُ وَالصَّبْرُ وَالْحِلْمُ وَالْبَيَانُ وَالْحَسَبُ، وَفِي الْإِسْلَامِ زِيَادَةُ الْعَفَافِ.

(অর্থ:) হযরত আবূ আমের ইবনুল 'আলা বলেন, যার মধ্যে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটতো জাহেলীযুগে লোকেরা কেবল তাকেই নেতা মেনে নিতো। ইসলাম ধর্ম সপ্তম আরেকটি বৈশিষ্ট্যকে জরুরী সাব্যস্ত করে এতে পূর্ণতা দান করেছে। ধৈর্য, বীরত্ব, সহনশীলতা, দানশীলতা, বাগ্মীতা ও বংশ-মর্যাদা। ইসলামে পূর্ণতা দানকারী গুণটি হলো চারিত্রিক নিষ্কলুষতা। (আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ ওয়ালমিনাহুল মারয়িয়্যাহ;২/২১৫)

সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে গোস্বার সময়। হযরাত লোকমান হাকীম তার পুত্রকে বলেন–

قال لقمان الحكيم لابنه: ثلاثة لا يعرفون الا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم الا عند الغضب، ولا الشجاع الا في الحرب اذا لقي الاقران، ولا اخاك الا عند الحاجة

(অর্থ:) তিন স্থানে তিনটি জিনিসের পরিচয় লাভ করা যায়। ক্রোধের সময় সহনশীলতার পরিচয়, যুদ্ধের সময় সাহসিকতার পরিচয় এবং প্রয়োজনের সময় ভ্রাতৃত্বের পরিচয়। (মাওসূআতু আখলাকিস সালাফ পৃ. ৭১৫)

এখনও জোনাক জ্বলে!

কেউ বলতে পারেন, এগুলো তো আগের যুগের কথা; যুগের পরিবর্তনে এই চরিত্র-মাধুরীরও ইতি ঘটেছে এবং এ যুগে এমন আচরণের চিন্তা করা অমাবস্যা রাতে সূর্য দেখার মতো! হ্যাঁ, যুগের পরিবর্তনে এমন মানুষের সংখ্যা কমে গেছে। কিন্তু একেবারেই অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে এমনটি নয়। বরং এখনো জোনাক জ্বলে, এখনো দীপ্তি ছড়ায়; কিন্তু আমরা চোখ বুজে থাকি বলে সে আলো আহরণে সক্ষম হই না। দূরের নয়, এ কালেরই একজন আদর্শ মনীষীর একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন। ২০০৭/৮ সালের কথা। আমার অগ্রজ মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব তখন রাহমানিয়ায় ইফতা বিভাগের ছাত্র। তখনকার নেযাম ছিল, ইফতার ছাত্ররা পালাক্রমে জামি'আর শাইখ মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.-এর সঙ্গে সফরকালীন খাদেম হিসেবে যেতে পারতেন। তো বড় ভাই মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি– তখনকার ছাত্র, এখনকার উস্তাদ মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী হুযূর আর আমার বড় ভাই পঞ্চগড়-দিনাজপুর সফরে মুফতী সাহেব হুযূরের খাদেম ছিলেন। রাতের বেলা ফেরার পথে সিদ্ধান্ত হয় টাঙ্গাইলী হুযূর রাত ১২টা পর্যন্ত আর অবশিষ্ট রাত আমার বড় ভাই মুফতী সাহেব হুযূরের পাশে বসবেন এবং নিজেরা সজাগ থেকে হুযূরের আরামের প্রতি খেয়াল রাখবেন। বড় ভাই বলেন, টাঙ্গাইলী হুযূর তো রাত ১২টা পর্যন্ত ঠিক-ঠাকভাবেই হুযূরের সঙ্গে ছিলেন। রাত ১২টার পর আমি হুযূরের পাশের সিটে বসলাম। বুক ভরা আশা ছিল রাতভর হুযূরের খেদমত করব। আকস্মিক ফজরের আযান শুনে লাফিয়ে উঠলাম। লজ্জায় মাথা নুয়ে গেল। খাদেম হয়ে মাখদুম সেজে কখন যে হুযূরের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি–কিছুই বলতে পারি না! আর হুযূরও যে কেমন, ইশারা-ইঙ্গিতেও আমাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করলেন না! এতোদিন পরও যখনই ঘটনাটি মনে পড়ে, সংকোচে এতোটুকুন হয়ে যাই। যাই হোক, হুযূর আমার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন– ঘাবড়াবার কী আছে! আমার যেমন ঘুমের প্রয়োজন হয়, তোমারও তো ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! শিক্ষা গ্রহণের অনেক উপাদানই আমরা বক্ষ্যমাণ লেখাটিতে পেয়েছি। এখন বাকি কেবল সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজানো। অবশ্য কখনো অধীনস্তদের তরবিয়তের জন্য কড়া আচরণও করতে হয়। সে ক্ষেত্রেও মাত্রাজ্ঞান বিবেচনায় রাখতে হবে। পরিমিতিবোধ অন্য সকল বিষয়ের মত এখানেও জরুরী। সকল সুন্দরকে আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আমীন!

শিক্ষার্থী: ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

শিক্ষার্থীর পাতা

তালিবে ইলমের উদ্দেশে অমূল্য উপদেশমালা-২

সংকলক : মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ফরিদপুরী

যখন নিয়মতান্ত্রিক তালিবে ইলম ছিলাম তখন থেকেই আসাতিযায়ে কিরামের বিভিন্ন নসীহত ডায়েরিতে টুকে রাখার অভ্যাস ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, এ অভ্যাস এখনও বহাল আছে। মনি-মুক্তা তুল্য সে উপদেশমালার নির্বাচিত অংশ তালিবে ইলমদের খেদমতে পেশ করা হল। উল্লেখ্য, নসীহতগুলোর কোনটিই আমার নয়, সবগুলোই আমার মাথার তাজ আসাতিযায়ে কিরামের যবান থেকে শোনা। আল্লাহ তা'আলা আমাকেসহ সকল তালিবে ইলমকে এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আ-মীন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর...)

৫৯. যার সঙ্গে আমি কোনভাবে সম্পৃক্ত আছি যেমন উস্তাদ, পিতা, বড়ভাই। তো এঁদের নিকট ফোনে নিজের পরিচয় এভাবে বলা উচিত যে, হুযূর! আমি আপনার ছাত্র নাঈম, অথবা আব্বা! আপনার ছেলে হাবীব, কিংবা ভাইজান! আমি আপনার ছোট ভাই শামীম। শুধু নাম বললে অনেক সময় দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, কোন নাঈম? কোন হাবীব? কোন শামীম?। উস্তাদকে এমন মুহাব্বাত করা উচিৎ যে, উস্তাদের সবকিছু ছাত্রের চেনা-জানা থাকে। যেমন উস্তাদের ব্যবহারের লুঙ্গী-গামছা, প্লেট-বাটি, জুতা-স্যান্ডেল, সাবানদানী ইত্যাদি। এর দ্বারা উস্তাদের কাজে সহযোগিতা করা সহজ হয়।

৬০. বিপরীতমুখী দু'টি জিনিসের কোন একটির ব্যাপারে লাভবান হতে চাইলে অপরটি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন: নেকী-বদী, দুনিয়া-আখিরাত ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে নেকী ও আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬১. দুনিয়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা বাকী থাকে। কিন্তু আখেরাতের পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সফলতার আর সুযোগ থাকবে না। এজন্য দুনিয়ার পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না, যার দ্বারা আখেরাতে ব্যর্থ হতে হয়।

৬২. উস্তাদের খিদমত করার সময় সওয়াবের নিয়তে কবূলিয়তের আশায় এই দু'আ পাঠ করবে– ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

৬৩. ছাত্রদের স্তর: উস্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখার ভিত্তিতে ছাত্রদের স্তর বিন্যাস হলো–
১. মাহবূবীন (مَحْبُوْبِيْن) প্রিয়ভাজন।
২. মুহিব্বীন (مُحِبِّيْن) মুহব্বতকারী।
৩. মুতা'আল্লিকীন (مُتَعَلِّقِيْن) সম্পর্ক রাখে।
৪. গাফেলীন (غَافِلِيْن) উদাসীন।
৫. মু'রিযীন (مُعْرِضِيْن) উপেক্ষাকারী।

৬৪. উস্তাদের তাকরীর বাদ দিয়ে কোন কিতাবের নোট বা শরাহ পড়ার অর্থ হলো উস্তাদের দরসের প্রতি আমার আস্থা নেই; বরং নোটই যেন আমার উস্তাদ! হ্যাঁ, উস্তাদের তাকরীর আয়ত্ত করার পর আরও সবিস্তারে জানার জন্য শরাহ দেখা যেতে পারে। তবে সেটাও উস্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে।

৬৫. কোন উস্তাদ বা বড় কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার থেকে দূরে দূরে থাকা সমাধান নয়; বরং কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া এবং অসন্তুষ্টির কারণ জানা থাকলে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটানো। আর কারণ জানা না থাকলে কারণ জানার চেষ্টা করা।

৬৬. উস্তাদ থেকে ইলম আহরণের উপমা হলো পাত্র পরিবর্তন। অর্থাৎ এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে কোন বস্তু স্থানান্তর। পাত্রে রাখা জিনিস স্থানান্তরের সময় যেভাবে খালি পাত্রটি ভরা পাত্রের মুখের সঙ্গে লেগে থাকতে হয় তেমনিভাবে উস্তাদ থেকে ইলম গ্রহণের ক্ষেত্রেও উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রকে লেগে থাকতে হয়, উস্তাদের দীর্ঘ সোহবতের প্রয়োজন হয়।

৬৭. যে ছাত্রের কোন উস্তাদের ব্যাপারে শরীয়তে অবৈধ নয় এমন কোন কাজে ইশকাল বা আপত্তি হয় সে পরবর্তীতে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

৬৮. উন্নতি বা সফলতার প্রথম ধাপ হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

৬৯. ইলম একটি আলো। এর দ্বারা সঠিক পথের পরিচয় জানা যায়। কিন্তু পথ চলতে হলে শুধু পথের পরিচয় পাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং পথ চলার জন্য ভিন্ন শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। সেটা হলো আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও আল্লাহ তা'আলার ভয়।

৭০. সামান্য ইলম কাজে লাগাতে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। আর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় দুই জিনিস দ্বারা– ১. সোহবত। ২. তাবলীগে সময় লাগানো।

৭১. আমাদের সম্পর্ক আসমানী ইলমের সাথে এ নিসবত সবচেয়ে দামী।

৭২. ইলমের ফযীলতের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, ইলম বাড়ানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'আ শিখিয়েছেন رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

৭৩. ইলমের তিনটি স্তর। ১. হুছূল (ইলম অর্জন করা)। ২. উসূক (ইলমের ক্ষেত্রে আস্থা অর্জন)। ৩. রুসূখ (ইলমের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অর্জন)। ইলম অর্জন হবে বেশী বেশী মেহনত দ্বারা। ইলমের ক্ষেত্রে আস্থা অর্জন হবে অধিক মুতালা'আ দ্বারা। আর দৃঢ়তা আসবে রাসেখীনদের সোহবত দ্বারা।

৭৪. ইলমের উমূক (গভীরতা) কাঙ্ক্ষিত হওয়া চাই; ব্যাপকতা মূল উদ্দেশ্য নয়।

৭৫. ইস্তি'দাদ (যোগ্যতা) দুই প্রকার। ১. কিতাবী ইস্তি'দাদ (কিতাবকেন্দ্রিক যোগ্যতা)। ২. ফন্নী ইস্তি'দাদ (শাস্ত্রীয় দক্ষতা)।

৭৬. 'তালেব' বঞ্চিত হয় না আর 'গাফেল' সফলকাম হয় না।

৭৭. শুকরিয়ার প্রথম শর্ত হলো নেয়ামতকে নেয়ামত মনে করা।

৭৮. ইলমের জন্য মুজাহাদা: ইলমে দীন অর্জন করার জন্য প্রচুর কষ্ট-মুজাহাদা করা উচিৎ। উদাহরণত তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম-এর ভূমিকায় আছে, হযরত ইবনে আবী হাতেম রহ. বলেন, আমরা দুই সাথী সাত মাস মিশরে অবস্থান করেছি। এই সাত মাসে রুটির সঙ্গে কোন রকম তরকারী খাওয়ার সুযোগ হয়নি। আমাদের প্রতিটি দিবস শায়েখদের নিকট দরসের জন্য বন্টন করা ছিল। আর রাতগুলো তাকরার ও দরসের তাকরীর পরিচ্ছন্ন করার জন্য বরাদ্দ ছিল। একদিন আমি আর আমার সহপাঠি শায়েখের নিকট দরসের জন্য উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি তিনি অসুস্থ। ফেরার পথে একটি মাছ পছন্দ হলে আমরা সেটি ক্রয় করলাম। এদিকে আমরা ঘরে পৌছতে পৌছতে অন্য দরসের সময় হয়ে গেল। ফলে মাছটি রান্না করার সুযোগ হলো না। এভাবেই মাছটি রেখে দরসের জন্য চলে গেলাম। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মাছটিও

পচে যাওয়ার উপক্রম হল। ফলে মাছটি আর ভাজার সুযোগ হলো না। আধাপঁচা সেই মাছ কাচাই খেয়ে নিলাম। এরপর হযরত ইবনে আবী হাতেম রহ. বলেন, 'দৈহিক আরাম-আয়েশের সাথে ইলম অর্জন সম্ভব নয়।' (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ১/৮-৯)

৭৯. মানুষের দিকে লক্ষ্য করে কোন কাজ ছেড়ে দেয়া রিয়া। পক্ষান্তরে মানুষের দিকে লক্ষ্য করে কোন কাজ করা শিরক। আর ইখলাস হলো উল্লিখিত দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া।

৮০. মানুষের স্বভাব হলো বিপদে পড়লে তাওবা করে আর বিপদমুক্ত হলেই পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হয়। (সূরা আন'আম-২৮, সূরা ইউনুস-২২,২৩, সূরা যুখরুফ-৫০)

৮১. আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুত্তাকী হতে বলেছেন। সুতরাং আমাদের মুত্তাকী হওয়া উচিত। আর তাকওয়ার তাকাযা হলো সন্দেহ ও ইখতিলাফপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। অথচ আমরা ইখতিলাফের অজুহাত দিয়ে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হই। এটি একেবারেই অনুচিৎ।

৮২. আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন, মুত্তাকী ছাড়া কিয়ামতের দিন বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না। (সূরা যুখরুফ-২৭)

৮৩. যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে উপাস্য বা রাহবার বানায় তার ইন্দ্রীয় শক্তি কাঙ্ক্ষিত কাজে ব্যবহৃত হয় না। (সূরা জাসিয়া-২৩)

৮৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত, কখনো মানুষ গুনাহের কারণে অনেক ইলম ভুলে যায়। এর সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত আয়াত তিলাওয়াত করেন–

وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

৮৫. গুনাহের ছিদ্রপথও বন্ধ রাখা উচিত। কারণ অতি ছোট গুনাহই বড় গুনাহের উপলক্ষ হয়। ছোট গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়াও কবীরা গুনাহ।

৮৬. গুনাহের ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়া যতোটুকু সহজ গুনাহের বড় পথ বন্ধ করা ততোটুকু সহজ নয়।

৮৭. যে আনুগত্য গুনাহের দিকে ধাবিত করে সে আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব। (সূরা আন'আম-১০৮, তাফসীরে আবিস সাঊদ)

৮৮. সকল কবীরা গুনাহের মূল হল প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। এজন্য সূফিয়ায়ে কেরাম সেটার মূলোৎপাটনের গুরুত্বারোপ করেন।

৮৯. গুনাহে লিপ্ততা যোগ্যতাকে নিঃশেষ করে দেয়। (সূরা মায়িদা-৭১, বয়ানুল কুরআন)

৯০. কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা: কবীরা গুনাহ বলা হয়– ১. যে গুনাহের ব্যাপারে কুরআন বা হাদীসে ধমকি, শাস্তি বা অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। ২. যে গুনাহে এমন ক্ষতি আছে যার উপর কুরআন বা হাদীসে ধমকি, শাস্তি বা অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। ৩. এমন কাজ যার দ্বারা দীনের কোন বিষয়ের তুচ্ছতা বা অপদস্থতা বুঝা যায়। (সূরা নিসা-৩১, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন)

৯১. যারা আল্লাহর পথের পথিক তারা ইলম অনুযায়ী আমল করতে চেষ্টা করে। আর যারা দুনিয়াদার তারা শুধু ইলমের জন্যই জ্ঞানের সাধনা করে।

৯২. মাদরাসার ছাত্র হোক বা স্কুলের ছাত্র হোক আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে তার উপকার হবেই। একজন মূর্খও যদি সোহবাতে আসে সে-ও কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ।

৯৩. কারও মধ্যে অন্তরের রোগ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে অপারেশন হওয়ার আগ পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৯৪. কারো প্রতি অবৈধ আসক্তি সৃষ্টি হলে তা দূর করার উপায় তিনটি– ১. সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়া। ২. অন্তর থেকেও পৃথক করে দেয়া। ৩. যদি তার কথা স্মরণ হয় তবে জাহান্নাম ও কবরের আযাব ইত্যাদির কথা স্মরণ করা। এরপর যতোটুকু বাকী থাকবে এতে তেমন ক্ষতি হবে না। (হযরত থানবী রহ.)

৯৫. আল্লাহ তা'আলা কখনো আমাদেরকে বিপদ দেন আমাদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য।

৯৬. বিপদের সময় সবরের অর্থ হলো শরীয়তের হুকুম-আহকামের উপর অটল থাকা এবং কোন অভিযোগ না করা।

৯৭. দুনিয়াতে কেউ শঙ্কামুক্ত নয়। কারণ গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত কেউ চিন্তামুক্ত থাকতে পারে না। উদাহরণত গন্তব্যে পৌঁছতে একশত সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। কেউ নব্বইটি সিঁড়ি অতিক্রম করেও চিন্তামুক্ত হতে পারে না যে, আমি পার হয়ে গেছি। পক্ষান্তরে কেউ একটিমাত্র সিঁড়ি অতিক্রম করেছে। অতঃপর সতর্কতার সঙ্গে উঠতে থাকলে একসময় সে-ও হয়তো সবগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

৯৮. কুদৃষ্টি হলো দুরারোগ্য ব্যাধি। কুদৃষ্টির মাধ্যমে যেমন মানুষের যাহের তথা বাহ্যিক নষ্ট হয় তেমনিভাবে কুদৃষ্টির মাধ্যমে বাতেন তথা অভ্যন্তরীন অবস্থাও নষ্ট হয়। যাহের দ্বারা উদ্দেশ্য শরীর আর বাতেন দ্বারা উদ্দেশ্য রূহ ও অন্তর।

৯৯. মানুষের দেহ যেমন রোগাক্রান্ত হয় তেমনিভাবে মানুষের রূহ বা আত্মাও রোগাক্রান্ত হয়। দেহের রোগের চিকিৎসা না হলে যেমন কষ্ট হয় তেমনিভাবে আত্মার রোগের চিকিৎসা না হলেও কষ্ট হয়। তবে দেহের রোগের কষ্ট অস্থায়ী; এর কষ্ট শুধু দুনিয়াতেই অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে আত্মার রোগের কষ্ট স্থায়ী অর্থাৎ দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানে ভুগতে হয়।

১০০. গুনাহের মৌলিক ক্ষতিসমূহ–
১. জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়। ২. ইজ্জত-সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। ৩. বরকত নষ্ট হয়ে যায়। ৪. একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ৫. সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, গুনাহের পরিণামে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১০১. পাপের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত যে সকল নেয়ামতের না-শোকরী হয়– ১. ইনসানিয়্যাত তথা মনুষ্যত্বের না-শোকরী করা হয়। ২. ইসলামের না-শোকরী করা হয়। ৩. সম্পদের না-শোকরী করা হয়। ৪. ইলমের না-শোকরী করা হয়। ৫. অঙ্গ-প্রতঙ্গের না-শোকরী করা হয়।

১০২. দুনিয়াতে গুনাহগার ও মুত্তাকী উভয়েই বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে গুনাহগারের মুসীবতের যামানা শেষ হয় না। আর মুত্তাকীর মুসীবতের যামানা দীর্ঘায়িত হয় না।

১০৩. ভুল স্বীকার ও সত্য মেনে নিতে সংকোচ করা উচিত নয়। এটা বিনয়ের দলীল।

১০৪. দীনকে আবেগের অনুগামী না করে আবেগকে দীনের অনুগামী করা উচিৎ।

১০৫. নিজের হক আদায়ে বাড়াবাড়ি করার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালা করা অধিক ফলদায়ক।

১০৬. ভালো মানুষ সে, যে হুকুকুল্লাহর সাথেসাথে হুকুকুল ইবাদ-এর প্রতিও খেয়াল রাখে।

১০৭. সাথী-সঙ্গীকে কখনো তুচ্ছ করা উচিত নয়। কারণ জানা নেই হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমার চেয়ে তার দ্বারা দীনের অধিক কাজ নিবেন।

১০৮. সাথী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্রের উচিত এমন সাথী নির্বাচন করা যে তার চেয়ে জ্ঞানে-গুণে ভালো।

১০৯. নিজের চেয়ে উপরের বা নীচের কোন ক্লাসের ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক না রাখা উচিৎ। এর দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশী থাকে।

১১০. নিজ ক্লাসের সাথী-সঙ্গীদের সাথে আপন ভাই সুলভ মহব্বত রাখা চাই।

এমন বন্ধুসুলভ সম্পর্ক পরিহার করা উচিৎ যার দ্বারা একসঙ্গে নাস্তা খেতে হয়, একসঙ্গে ঘুরতে যেতে হয়।

১১১. মেহমানদারীর প্রধান হক হলো মেহমানকে মেহমান হিসেবে জানা। যদি এটাই জানা না থাকে যে, ইনি আমার মেহমান তাহলে মেহমানদারী করা সম্ভব নয়।

১১২. মেহমানদারী চার প্রকার। ১. মনও ভরবে, পেটও পুরবে; যেমন দুপুরের খাবারের সময় (মেহমানের রুচি অনুযায়ী) বিরিয়ানী, পোলাও, ভাত, গোশত, মাছ ইত্যাদি দ্বারা খানার ব্যবস্থা করা। ২. মন ভরবে, পেট পুরবে না; যেমন দুপুরের খাবারের সময় কেকজাতীয় ভালো মানের নাস্তা দ্বারা আপ্যায়ন করা। ৩. পেট পুরবে, মন ভরবে না; যেমন দুপুরের খাবারের সময় পান্তা ভাত আর কাচা মরিচ দিয়ে আপ্যায়ন করা। ৪. মনও ভরবে না, পেটও পুরবে না। যেমন: দুপুরের খাবারের সময় চা-বিস্কুট দিয়ে নাস্তা পরিবেশন।

১১৩. দস্তরখানে মেহমানের সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত দু'একটি প্লেট, চায়ের কাপ রাখা উচিৎ। এতে হঠাৎ কেউ উপস্থিত হলে সে সংকোচবোধ করবে না।

১১৪. খানা পরিবেশনের একটি আদব হলো, খানা পরিবেশন করে পর্যবেক্ষণ করা আর খানা শেষে প্লেট, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি উঠিয়ে রাখা। বিশেষ করে কাউকে পানি বা চা পান করাতে হলে পান করানো শেষে জগ-গ্লাস ও কাপ-পিরিচগুলো উঠিয়ে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা।

১১৫. কাউকে পানি পান করাতে হলে গ্লাসের একেবারে নিচে অথবা নিচের অংশে ধরে পরিবেশন করা উচিৎ। অন্যথায় পরিবেশনকারীর হাতের ময়লা বা পানি গ্লাসের উপরের অংশে লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা পানকারীর জন্য অরুচির কারণ হতে পারে।

১১৬. কাউকে পান খেতে দিলে সাথে পিকদানটাও এনে দেয়া উচিৎ।

১১৭. মেহমাদারীর ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো মেহমানকে বসানো। দ্বিতীয় কাজ হলো মেহমানদের হাত ধোয়ানো। তৃতীয় কাজ হলো দস্তরখান বিছানো। চতুর্থ কাজ হলো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উপস্থিত করা। যেমন: জগ, গ্লাস, বোনপ্লেট, লবণদানী, প্লেট ইত্যাদি। এরপর ভাত-তরকারী, পোলাও-বিরিয়ানী ইত্যাদি উপস্থিত করা।

১১৮. মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত সব কিছু দস্তরখানে উপস্থিত করে পরিবেশন শুরু করা, যাতে মেহমান তার পছন্দমত খাবার গ্রহণ করতে পারেন।

১১৯. ছোট মজলিসে খাবার পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমীরে মজলিস থেকে খানা পরিবেশন শুরু করা।

১২০. বড় মজলসে খানা পরিবেশনের ক্ষেত্রে মেহমানদের ডান দিক থেকে খাবার পরিবেশন করা।

১২১. পরিবেশনের সময় প্রথমবারই অনেক বেশী খানা না দেয়া; বরং প্রথমে অল্প করে দিয়ে এরপর প্রয়োজন বুঝে খেয়াল করে দেয়া।

১২২. মেহমানদারী গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকাল্লুফী (লৌকিকতা) না করা। কারণ এতে তাকলীফ (কষ্ট) হয়।

১২৩. কয়েকজন মেহমানকে খানা পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোন একজনকে বেছে বেছে গোশত বা মাছ না দেয়া, এতে অন্যের হক নষ্ট করা হয়, আবার যাকে দেয়া হয় সে-ও ইতঃস্তত বোধ করে।

১২৪. মজলিসে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আশে-পাশে খেয়াল রাখা, যাতে অন্যকে পানি ঢেলে দিয়ে, লবণের বাটি, বোন প্লেট ইত্যাদি এগিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করা যায়।

সংকলক: আমীনুত তা'লীম, মা'হাদু উলূমিল কুরআন, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর-১৩, ঢাকা।

মারকাযুল কুরআন মুহাম্মদপুর ঢাকা
শতভাগ মানুষের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছানোর লক্ষ্যে
বাড়ি নং-৩৪, রোড নং-১ (বাঁশের পুলের পশ্চিমপার্শ্ব সংলগ্ন), স্বপ্নধারা হাউজিং বসিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

আবাসিক / অনাবাসিক
বিভাগসমূহ
- সুশৃঙ্খল মক্তব বিভাগ
- আদর্শ নাযেরা বিভাগ
- মানসম্পন্ন হিফজ বিভাগ
- আল-আবরার ইসলামীক একাডেমী
- নৈশ বিভাগ

ভর্তি চলছে
আসন সংখ্যা সীমিত

মাদরাসার বৈশিষ্ট সমূহ

সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

★ পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, একান্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে শিক্ষাদান
★ অভীজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পাঠদান
★ কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ
★ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা
★ এতীম, অসহায়, অসচ্ছল, মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরিচালক ঃ
হাফেয মাওলানা মুফতী আব্দুল লতীফ দাঃ বাঃ
মোবাইল ঃ ০১৯২৪৭৩৮৪৪১, ০১৯৭৪৭৩৮৪৪১

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী দাঃ বা
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বাইতুস সুজূদ জামে মসজিদ, ঢাকা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

রিজওয়ানুর রহমান
ঢাকা

৩৯৯ প্রশ্ন : (ক) আজকাল মসজিদসমূহে ফরয নামাযের পর বিভিন্ন ধরণের এ'লান কিংবা দু'আর আবেদন করা হয়। এতে সাধারণত মাসবুকদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে থাকে। জানার বিষয় হলো–

ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর এ ধরণের এ'লান কিংবা দু'আর আবেদন করা কতোটুকু শরীয়তসম্মত?

(খ) আমাদের সমাজে জানাযার নামাযের পূর্বে মায়্যিতকে সামনে রেখে তার আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিতজনেরা বক্তব্য দিয়ে থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে তো প্রয়োজনীয় এ'লানই হয়ে থাকে। যেমন: মাইয়েতের দেনা-পাওনা ইত্যাদি ব্যাপারে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ইত্যাদি। কিন্তু এছাড়াও মৃত ব্যক্তির ভালো বিষয়গুলো নিয়ে কিংবা স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যও দেয়া হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামে কতোটুকু অনুমতি আছে? আর নাজায়েয হলে জায়েযের সীমা কতোটুকু?

উত্তর (ক) ফরযের পর সুন্নাত না থাকার কারণে ফজর ও আসরের ওয়াক্তে সালাম ফেরানোর পরপরই এ'লান করার সাধারণত প্রয়োজন হয় না। কাজেই এ দুই ওয়াক্তে মাসবুকদের নামায শেষ হওয়ার পর এ'লান করা উচিৎ। আর অন্য তিন ওয়াক্তে যেহেতু সুন্নাত আছে, তাই অতিজরুরী কোন এ'লান করতে হলে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে করবে। এ'লান সংক্ষিপ্ত হলে তাতে মাসবুকদেরও উল্লেখ্যযোগ্য ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এ সকল ওয়াক্তেও নামাযের সালাম ফেরানোর পর এমন দীর্ঘ সময় নিয়ে এ'লান করা জায়েয নেই, যার কারণে মাসবুকের অবশিষ্ট নামায আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। (ফাতাওয়া হাদীসিয়্যা; পৃষ্ঠা ৫৬, ফাতাওয়া শামী ১/৬৬০, ৬/৩৯৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩৮-৩৯)

(খ) হাদীস শরীফে মায়্যিতকে তাড়াতাড়ি দাফন করতে বলা হয়েছে। তাই জানাযার নির্ধারিত সময়ে মায়্যিতকে উপস্থিত করা হলে তখন মায়্যিতের স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা করে জানাযায় বিলম্ব করা নাজায়েয। অবশ্য মায়্যিতের কোন আত্মীয় তার পক্ষ থেকে অল্প সময়ে উপস্থিত লোকদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারবে এবং তার লেন-দেন বিষয়েও যিম্মাদারদের কথা বলে দিতে পারবে। আর শরীয়তসম্মত কোন কারণে জানাযায় বিলম্ব হলে জানাযার জন্য উপস্থিত লোকদের মায়্যিতের জন্য মাগফিরাতের দু'আ, ইস্তিগফার, কুরআত তিলাওয়াত ইত্যাদি করা উচিৎ। কারণ মৃত্যুর পর ঈসালে সওয়াব মায়্যিতকে উপকার দিবে; স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য কিংবা তার ভালো গুণাগুণের কৃত্রিম আলোচনা তার কোন কাজে আসবে না। অবশ্য উপস্থিত কোন বিজ্ঞ আলেম যদি মৃত্যু ও আখেরাত বিষয়ে কিংবা দাফন-কাফনের সুন্নাত তরীকা নিয়ে এবং মৃত্যুর পর মায়্যিতের আত্মীয়দের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন, তাহলে তা আরো ভালো হবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১০০৩, ১০১৫, ১০৫৮, ১০৭৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৬২, ফাতাওয়া শামী ২/২৪৩)

মুহাম্মাদ সিরাজুম মুনীর
ঢাকা

৪০০ প্রশ্ন : (ক) ফরয বা নফল নামাযের রুকু ও সিজদায় তাসবীহ ছাড়া অন্য কোন দু'আ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? আর তা রুকু-সিজদায় পড়া যাবে কি না?

(খ) রুকুতে কেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' পড়া হয় এবং সিজদায় কেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' পড়া হয়? এর হেকমত ও রহস্য কী?

উত্তর (ক) একাধিক হাদীসে এ বিষয়টি এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের রুকুতে سبحان ربي العظيم এবং সিজদায় سبحان ربي الأعلى যেমন পড়েছেন, তেমনি রুকু ও সিজদায় কখনও কখনও উল্লিখিত তাসবীহদ্বয় ব্যতীত অন্য দু'আ-তাসবীহও পড়েছেন। তবে ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যামতে রুকু ও সিজদায় অন্য দু'আ ও তাসবীহ পড়ার বিষয়টি একাকী নফল নামায আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই নফল নামাযে রুকু ও সিজদায় উল্লিখিত দুটি তাসবীহ ছাড়াও হাদীসে বর্ণিত অন্য যে কোন দু'আ বা তাসবীহ পড়া যাবে, বরং মাঝে মাঝে পড়াটাই উত্তম।

তবে ফরয নামাযের জামা'আতে ইমাম সাহেবের জন্য না পড়া উচিৎ। কারণ শরীয়তে ইমাম সাহেবকে নামাযে সুন্নাত কিরাআতের চেয়েও লম্বা কিরাআত, রুক-সিজদায় লম্বা দু'আ ও তাসবীহ পড়তে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে যদি কখনও কোন কারণে ফরয নামায একাকী আদায় করে তাহলে নফল নামাযের মতো সেখানে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়ার অবকাশ রয়েছে।

উল্লেখ্য, সর্বাবস্থায়ই রুকু ও সিজদার জন্য নির্ধারিত মূল তাসবীহর পরে হাদীসে বর্ণিত অন্য কোন দু'আ বা তাসবীহ পড়বে। নির্ধারিত তাসবীহ ব্যতীত শুধু দু'আ বা তাসবীহ পড়া সমীচীন নয়। অবশ্য তাসবীহের জন্য উল্লিখিত দুই বাক্য ছাড়া অন্য বাক্যও বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধরূপ জানা থাকলে মূল তাসবীহ হিসেবে সেগুলোও পড়া যাবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭৪১৪, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৮৮৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৮৭, আল-মাবসূত ১/১০৮, আল-বিনায়া ২/২৮৬, আস-সি'আয়া ফী কাশফি মা ফী শরহিল বিকায়া ১/১৮৮-১৯১, ফাতাওয়া শামী ১/৫০৫-৫০৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৩)

(খ) রুকুতে سبحان ربي العظيم ও সিজদায় سبحان ربي الأعلى নির্ধারণের মৌলিক কারণ তো এটাই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এভাবেই নির্দেশ প্রদান করেছেন। তথাপি, কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম রুকুতে سبحان ربي العظيم ও সিজদায় سبحان ربي الأعلى নির্ধারণের এই হেকমত বের করেছেন যে, যেহেতু সিজদার মধ্যে নামাযরত ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে তার সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ কপালকে মানুষের চলাচলের স্থানে রাখে, সেহেতু সিজদার মধ্যে রুকুর তুলনায় বান্দার বিনয়ের অধিক প্রকাশ ঘটে। এ কারণে সিজদায় আল্লাহর বড়ত্ব অধিক প্রকাশকারী শব্দ سبحان ربي الأعلى

(অর্থ : আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) পড়তে বলা হয়েছে। আর রুকুতে সিজদার তুলনায় বিনয়ের প্রকাশ কম, বিধায় আল্লাহর বড়ত্ব স্বাভাবিকভাবে প্রকাশকারী শব্দ سبحان ربي العظيم (অর্থ : আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। (হালাবাতুল মুজাল্লা ২/১৬৫, হাশিয়াতুশ শুরুম্বুলালী আলা দুরারিল হুক্কামি ফী শরহি গুরারিল আহকাম ১/১৩২)

আব্দুর রহমান
মোমেনশাহী

৪০১ প্রশ্ন : (ক) জনৈক আলেম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেন এবং এই দশদিন তিনি কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। তার বিস্তারিত বিবরণ এই–

১. পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ এই কিয়ামুল লাইল নিয়মিত হয়।

২. তিনি ই'তিকাফে বসলে কিয়ামুল লাইল হবে এটা প্রসিদ্ধ।

৩. তিনি কাউকে ডাক দেন না, বরং তিনি একাই দাঁড়িয়ে যান। তবে তিনি দাঁড়িয়ে গেলে মুসল্লীগণ একে একে আসতে থাকেন এবং পর্যায়ক্রমে এক/দুই/তিন কাতার পর্যন্ত হয় এবং জামা'আতের সুরত হয়।

৪. ঘুমের সময় মুসল্লীগণ নিজেরা পরস্পরকে কিয়ামুল লাইল শুরু হলে ডাক দিয়ে দিতে বলেন।

৫. ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর স্থানে তিনি দাঁড়িয়ে লাউড স্পিকার লাগিয়ে পড়তে শুরু করেন। এদিকে ই'তিকাফকারীগণ মসজিদের নিচ তলায় বা দ্বিতীয় তলায় ঘুমন্ত থাকে।

উল্লেখ্য, এভাবে ঘুমের সময় লাউড স্পিকার লাগিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু হলে কোন মুসল্লী কষ্ট মনে করেন না। বরং সকলে স্বেচ্ছায় কিয়ামুল লাইলে শরীক হয়ে যান এবং মসজিদের লাউড স্পিকার ব্যবহার তার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

আর লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার যুক্তি হলো, তিনি কিরাআত জাহরী পড়েন। আর লাউড স্পিকার ছাড়া জাহরী কিরাআত পড়লে তার গলা বসে যায়।

৬. কখনো কখনো তার কিয়ামুল লাইলের তিলাওয়াত রেকর্ড করা হয়।

৭. তিনি নিজেই বলেন, হানাফী মাযহাব মতে ডাকাডাকি করে জামা'আতের সাথে কিয়ামুল লাইল জায়েয নেই।

এমতাবস্থায় পূর্বে বর্ণিত সুরতে হানাফী মাযহাব মতে তার এই কিয়ামুল লাইলের হুকুম কী এবং বর্ণিত বিষয়গুলো নিষিদ্ধ ডাকাডাকির অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? দলীলসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

(খ) ফরয, সুন্নাত, বিশেষ করে নফল নামাযের রুকন তথা কিয়াম, রুকু বা সিজদার মধ্যে আরবী ভাষায় অথবা মাতৃভাষায় দু'আ করার হুকুম কী এবং কী ধরণের দু'আ করা উচিত?

উত্তর (ক) হানাফী মাযহাব মতে যে সকল নফল নামায জামা'আতে পড়ার বিষয়টি শরীয়তে বর্ণিত হয়নি যেমন তাহাজ্জুদ, কিয়ামুল লাইল ইত্যাদি, সে সকল নামায জামা'আত সহকারে আদায়ের ক্ষেত্রে প্রচারণা পাওয়া গেলে মাকরূহে তাহরীমী হবে। আর হানাফী ফুকাহাদের মতে প্রচারণার ব্যাখ্যা হলো, মুকতাদী তিনজনের বেশি হওয়া, অথবা একে অপরকে ডাকাডাকি করা। উলামায়ে কেরাম প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে নফল নামাযের জামা'আত নিয়মিত হলে সেটাকেও প্রচারণার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। সুতরাং উক্ত আলেমের বর্ণিত কিয়ামুল লাইল নিয়মিত ও প্রসিদ্ধ এবং মুকতাদীও তিনজনের বেশি, লাউডস্পীকারে কিরাআত পড়া অর্থাৎ প্রচারণার সকল ব্যবস্থাপনাই পাওয়া যাওয়ার কারণে মাকরূহে তাহরীমী হবে। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ২০৫৬, সুনানে দারিমী; হা.নং ১৪০৬, ফাতহুল বারী ২/২১৫, বাদায়িউস সানায়ে ১/২৯০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬৩, আউজাযুল মাসালিক ২/৭, আল-বাহরুর রায়িক ১/৩৬৬, ফাতাওয়া শামী ২/৪৮, ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ২৯৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৪/২২২, ইমদাদুল আহকাম ১/৬১১)

(খ) নামাযের ভিতরে আরবী ভিন্ন অন্য ভাষায় দু'আ করা মাকরূহে তাহরীমী। উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষ এর দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে নামাযের মধ্যে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আরবী দু'আ পাঠ করা উচিৎ। তবে নফল নামাযে রুকু-সিজদার নির্দিষ্ট তাসবীহাত পাঠ করার পর কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মাসূর দু'আগুলোর মধ্য থেকে কোন দু'আ করা বা তার সদৃশ কোন দু'আ করা জায়েয আছে। আর ফরয নামাযের জামা'আতে নির্ধারিত ওযীফা তথা দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত, রুকু সিজদায় নির্দিষ্ট তাসবীহাত ব্যতীত অন্য কোন দু'আ পড়া উচিত নয়। হ্যাঁ কোন কারণবশত ফরয নামায একাকী আদায় করলে নফল নামাযের মতো তাতেও দু'আ করা বৈধ হবে। (ফাতাওয়া শামী ১/৫০৫, ৫২১, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ১০০৯, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৭৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৭৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৩৯৭)

আসলাম সাদেক
সিংগাইর, মানিকগঞ্জ

৪০২ প্রশ্ন : SPC নামে একটি কোম্পানী আছে। এই কোম্পানীতে ব্যবসার ধরণ হলো–

১. প্রথমে কোম্পানীর আইডি ক্রয় করতে হয়। আর একটি আইডির মূল্য হলো ১২০০/- টাকা। এখন যদি কোম্পানী থেকে ১৩টি আইডি ক্রয় করা হয়, তাহলে তাকে মূল দাম থেকে ৬০০০/- টাকা ডিসকাউন্ট দেয়া হবে; চাই এক সাথে ১৩টি আইডি ক্রয় করুক বা ভিন্ন ভিন্ন করে করুক।

অতঃপর তার অ্যাকাউন্ট নাম্বারে প্রতিদিন প্রতি আইডিতে কোম্পানীর পণ্যের পাঁচটি করে অ্যাড আসে। অ্যাড চালু করার ৫ সেকেন্ড পর স্ক্রীনে সাবমিট লেখা উঠে, সাবমিট করলে টাকা পাবে, অ্যাড দেখুক বা না দেখুক।

২. কেউ সদস্য হওয়ার পর যদি অন্য কাউকে সদস্য বানাতে পারে তাহলে কোম্পানী এজন্য তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট দিবে। এভাবে পরবর্তী বিশ জেনারেশন পর্যন্ত সদস্য বানালে প্রথম ব্যক্তি টাকা পাবে।

৩. সদস্য হওয়ার পর যদি সে এই কোম্পানী থেকে কোন পণ্য ক্রয় করে তাহলে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিসকাউন্ট দেয়া হবে।

এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসা করা সহীহ আছে কি না?

strom7.org কোম্পানীর ব্যবসার সূরত– ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক মাদরাসার তালিবে ইলম ভাইয়েরা এই ব্যবসার সাথে জড়িত আছে। তার নাম হলো, strom7.org অর্থাৎ ইস্ট্রম সেভেন ডট ও.আর.জি। তার ধরণ এমন যে, একজন সদস্যের প্রথমে ৮৮০০/- টাকা ইনভেস্ট করতে হয়। তারপর থেকে দৈনন্দিন কিছু বিজ্ঞাপন আসে, যা ক্রোমের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। তার বিনিময়স্বরূপ অ্যাকাউন্টে দৈনিক জমা হয় প্রায় দুই ডলার থেকে কিছু কম-বেশি যা বাংলাদেশের সমান ১৭০/- অথবা ১৮০/- টাকা। আর এ টাকাগুলো উত্তোলন করতে গেলে একটি শর্ত

রয়েছে। তা হলো, আরেজনকে এই সংস্থার সদস্য বানাতে হবে, অন্যথায় টাকা উত্তোলন করা যাবে না। অন্য সদস্য ঢুকানোর পর সে যা ইনকাম করবে তার ইনকাম থেকে যার মাধ্যমে ঢুকেছে তার অ্যাকাউন্টে ১২% চলে যাবে। এটা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে তার কোনো জায়েয পদ্ধতি আছে কি না?

আর যখন সদস্য নিয়োগ দেয়, তখন অফিস থেকে তার অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪০০/- অথবা ৪৫০/- টাকা জমা হবে। তাছাড়া কেউ যদি বিজ্ঞাপন দেখতে অনিচ্ছুক থাকে, তাহলে তার বের হওয়ার সুযোগও আছে। তবে তার থেকে ২০০০/- অথবা ৩০০০/- টাকা রেখে দিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিবে।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত SPC কোম্পানীর আইডি ক্রয় করা ও ইস্ট্রম সেভেন ডট ও.আর.জি কোম্পানীতে ইনভেস্ট করার দ্বারা না কোন পণ্য ক্রয় করা হয়, না কোম্পানীর সাথে শিরকাত মুদারাবার ভিত্তিতে কোন ব্যবসায়িক চুক্তি করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এখানে পণ্য ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। আর পণ্য ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তে বৈধ নয়। আর অ্যাড চালু করে সাবমিট করা অথবা বিজ্ঞাপনে ক্রোমের মাধ্যমে কাজ করা শরীয়ত বা সমাজের দৃষ্টিতে এমন কোন শ্রম নয়, যার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে। সুতরাং এ ধরনের অ্যাড বা বিজ্ঞাপন দেখে বিনিময় গ্রহণ করা কোনভাবেই জায়েয হবে না। আর বিশ জেনারেশন পর্যন্ত সদস্য বানানোর পার্সেন্টিস গ্রহণ করা এটা মাল্টিলেভেল সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত যা একাধিক কারণে নাজায়েয ও হারাম। এমন নাজায়েয ও ফালতু কাজের বিকল্প কোন ব্যবসা জায়েয হওয়ার সুযোগ নেই। ব্যবসা করতে চাইলে পণ্যনির্ভর বহু ব্যবসা আছে। সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেটা ভালো মনে হয়, সেটা গ্রহণ করলেই হলো। সুতরাং উল্লিখিত দুটি কোম্পানীরই আইডি ক্রয় করা বা তাতে সদস্য হওয়া, সদস্য বানানো, অ্যাড দেখে টাকা নেয়া ও পণ্য ক্রয় করে ডিসকাউন্ট গ্রহণ করা কোনটিই শরীয়তে জায়েয নেই। (সূরা বাকারা-২৭৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৬৬২৮, ফাতাওয়া শামী ৫/৮৪, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ৩১৮, ফিকহুল বুয়ূ' ১/২৮৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/৪৪৮)

জালাল আহমাদ
কলাবাগান, ঢাকা

৪০৩ প্রশ্ন : (ক) জনৈক ডাক্তারের চেম্বারে মূল্যবান কিছু মেশিন ও যন্ত্রপাতি ছিলো। দেশের প্রসিদ্ধ একটি বেসরকারি চক্ষু হাসপাতাল তার সেই মেশিনগুলোর একটি মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয় করে নেয়। আর সে ডাক্তারকে ঐ বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালের শেয়ার হোল্ডার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত ডাক্তার তার শেয়ারের যাকাত কিভাবে আদায় করবেন?

(খ) সদ্য বিবাহিতা আমেরিকায় পড়াশোনারত একজন নারীর কাছে কিছু স্বর্ণ রয়েছে। আরও কিছু স্বর্ণ দেশে তার পরিবারের কাছে রয়েছে। এখন যদি দেশে বসবাসকারী তার পিতা তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে তার মোট স্বর্ণের মূল্য কিভাবে হিসাব করবে?

(গ) ১. উযূর সময় থুতনির নিচ থেকে হলক পর্যন্ত স্থানটিতে এবং হাত-পায়ের নখের নিচে খেয়াল করে পানি পৌঁছানো আবশ্যক কিনা? বিশেষত যদি কখনো নখ বড় থাকে?

২. নামাযের পর কেউ যদি দেখে, চোখে সামান্য ময়লা শক্ত হয়ে আছে তাহলে নামায দোহরাতে হবে কি না?

উত্তর : (ক) ডাক্তার সাহেব হাসপাতালের শেয়ার হোল্ডার হওয়ায় তাতে শেয়ার অনুপাতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব বছরান্তে হাসপাতালের সকল সম্পদের হিসাব করে দেখতে হবে যে, হাসপাতাল বর্তমানে কী পরিমাণ সম্পদের মালিক?

এদিকে হাসপাতালের কিছু সম্পদ থাকে যা যাকাতযোগ্য নয়। যেমন বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি। আর কিছু সম্পদ থাকে যাকাতযোগ্য। যেমন ক্যাশ টাকা ও বিক্রয়যোগ্য পণ্য এবং অন্যদের নিকট থেকে প্রাপ্য পণ্য বিক্রির মূল্য ইত্যাদি। অতএব যাকাতযোগ্য সম্পদের মধ্য হতে আনুপাতিক হারে তিনি যে পরিমাণের মালিক হবেন ব্যক্তিগতভাবে প্রতি বছর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা যাকাত পরিমাণ হয়েছে কি হয়নি?

যদি পূর্ব থেকেই যাকাতের নেসাব থাকে তাহলে ঐ নেসাবের সঙ্গে এই টাকারও যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে এই টাকার পৃথক নেসাব হওয়া বা পৃথকভাবে এক বছর সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। আর যদি পূর্ব থেকে যাকাতের নেসাব না থাকে তাহলে দেখতে হবে, এই টাকা এবং অন্যান্য সম্পদ মিলে যাকাত পরিমাণ হয় কি না? অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল্যসহ যাকাতের নেসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিবেন, অন্যথায় যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তিনি হাসপাতাল থেকে যে পরিমাণ আর্থিক সুবিধা/মুনাফা পান তা হস্তগত হওয়ার পর এর উপর যাকাতের হিসাব প্রযোজ্য হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৬৭, ৩০৪, দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/১৭২-১৭৩, তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহু কানযুদ দাকায়িক ১/২৫৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৪৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/১০৫)

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে ঐ নারী তার সাথে থাকা অলংকারের হিসাব আমেরিকার রেটে করবে। আর বাংলাদেশে থাকা অলংকারের হিসাব বাংলাদেশের দরে করবে। আর যেখানে যাকাত ব্যয় করা বেশি জরুরী সেখানকার যাকাতযোগ্য খাতে ব্যয় করবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮০, ১৯০)

(গ) ১. উযূতে চেহারার সীমা হলো, দৈর্ঘ্যে কপালের উপরিভাগ থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত (থুতনির শেষ পর্যন্ত)। আর প্রস্থে দুই কানের লতি পর্যন্ত। উযূতে থুতনির নিচ থেকে হলক পর্যন্ত স্থানটি ধৌত করা ফরয নয়।

হাত পায়ের নখে যদি এ পরিমাণ ময়লা থাকে যে, তার নিচে পানি এমনিতে পৌঁছে না। তাহলে খেয়াল করে তার নিচে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। আর যদি নখ স্বাভাবিক থাকে এবং ময়লার পরিমাণ খুব কম থাকে তাহলে শুধু পানি প্রবাহিত করে দিলে হবে। হাত-পায়ের নখ সাধারণ অবস্থায় প্রতি সপ্তাহে কাটা মুস্তাহাব। নখ বড় রাখা জায়েয নয়।

২. উযূর সময় চোখের ভিতর পানি পৌঁছাতে হবে না। তাই চোখের ময়লার ক্ষেত্রে কথা হলো– চোখ বন্ধ করলে ময়লা যদি চোখের ভিতরে থাকে তাহলে ময়লা সরানো আবশ্যক নয়। আর যদি স্বাভাবিকভাবে চোখ বন্ধ করলে ময়লা চোখের বাইরে থাকে, তাহলে ময়লার নিচের চামড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে যদি মনে হয় যে, উযূ করার সময় ময়লার নিচে পানি পৌঁছেনি, তবে নামায পুনরায় আদায় করে নিবে। আর যদি উযূ করার সময় ময়লার নিচের চামড়ায় পানি পৌঁছেছে বলে বিশ্বাস হয়, তবে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না। সর্বাবস্থায়

উযূতে ধোয়ার অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঘষে-মেজে উযূ করা চাই, যাতে কোনো জায়গা শুকনো না থেকে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনে সন্দেহের সুযোগ তৈরি না হয়। (সূরা মায়িদা-৬, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/২-৩, আস-সি'আয়া ১/৪৬-৪৭, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/৩৩, আল-বাহরুর রায়িক ১/১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪, ফাতহুল কাদীর ১/১৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৫৫, ৩/৮০)

আজিজুল হক
নারায়নগঞ্জ

৪০৪ প্রশ্ন : আমার এক নিকটাত্মীয় কুরবানীর ঈদে বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু গরু পালন করে থাকেন। তার যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর তিনি গরুর সম্ভাব্য মূল্যের সাথে গরুর খাদ্য, যা যাকাত আদায়কালে বিদ্যমান ছিলো তথা খড়কুটা, ভূসি ইত্যাদির মূল্যকেও যাকাতের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে যাকাত আদায় করেছেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো– গরুর এসব খাদ্য যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? বর্তমানে গরুর জন্য যে ঘাস চাষ করা হয়, তা যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? গবাদী পশুর এসব খাদ্য নিজস্বভাবে থাকা আর ক্রয় হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? এছাড়া কেউ যদি ব্যবসার নিয়ত ব্যতীত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়েকটি গাড়ী রাখে, তাহলে ঐ গাড়ীর উপর যাকাত আসবে কিনা?

উত্তর : কোনো মাল যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলে তার উপর যাকাত আসে। কিন্তু ঐ মাল হেফাযত করতে যেসব আসবাবের প্রয়োজন হয়, তার উপর যাকাত আসে না। সুতরাং আপনার নিকটাত্মীয়ের জন্য গবাদি পশুর খাবারের যাকাত আদায় করা জরুরী নয়। বর্তমানে গরুর জন্য জমিতে যে ঘাস চাষ করা হয়, তার উপর যাকাত প্রযোজ্য নয়।

গবাদি পশুর ক্রয়কৃত খাবার ও চাষ করা খাবারের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

কেউ যদি ব্যবসার নিয়ত ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়েকটি গাড়ী রাখে, তাহলে ঐ গাড়ীর উপর। যাকাত আসবে না। হ্যাঁ, ঐ গাড়ী দিয়ে যদি উপার্জন করে, তাহলে তার উপার্জিত সম্পদের উপর যাকাত আসবে।

উল্লেখ্য, ঐ বাড়তি গাড়ীর কারণে কুরবানী ওয়াজিব হবে। (সূরা তাওবা-১০৩, আল-হিদায়া শরহু বিদায়াতুল মুবতাদী ১/৯৬, ফাতাওয়া শামী ২/২৬২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১৪৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৬৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪৭০)

মুহাম্মাদ রূহুল এহ্সান
শুভাঢ্যা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

৪০৫ প্রশ্ন : (ক) আমার এক আত্মীয়ের ঢাকায় একটি জমি ক্রয় করা ছিলো। জমিটিতে মুনাফার ভিত্তিতে (G+৬তলা) একটি ভবন নির্মাণ করে দেয়ার জন্য আমি বিনিয়োগ করতে সম্মত হই। জমির মালিককে সরাসরি অর্থ না দিয়ে আমি আমার দায়িত্বে ভবনটি নির্মাণ করে দিচ্ছি। ভবনটি নির্মাণ করতে প্রায় ৩ বছর লেগে যাবে। বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে ভবনের একটি ফ্লোর ক্রয় বাবদ নির্ধারিত অংক কেটে নেয়া হবে এবং আমাকে ঐ ফ্লোরের মালিকানা প্রদান করা হবে। নির্ধারিত অংকটি হলো, জমির বর্তমান মূল্য এবং ভবন নির্মাণ করতে যা খরচ হবে উভয়ের সমষ্টির ৬ ভাগের এক ভাগ। বাকি বিনিয়োগকৃত অর্থ (সম্পূর্ণ ভবন নির্মাণের পর) মাসিক নির্ধারিত মুনাফাসহ ৮৪ কিস্তিতে (৮৪ মাসে) সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করবেন।

এখন জানার বিষয় হলো, বর্তমানে আমি এই বিনিয়োগকৃত অর্থ (যার মধ্যে ১টি ফ্লোর ক্রয় বাবদ অর্থও রয়েছে) এর যাকাত কি আদায় করবো? আদায় করতে হলে যাকাত কিভাবে হিসাব করবো?

(খ) ২০১১ সালে আমি একটি জমি ক্রয় করি। উদ্দেশ্যে ছিলো জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে লাভজনক হলে জমিটি বিক্রি করে দিবো। তাই ২০১১ এবং ২০১২ এই দুই বছর আরবী মাস অনুসারে আমি তৎকালীন মূল্যের উপর যাকাত আদায় করি। কিন্তু পরবর্তীকালে জমির দখলসংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেয়ায় জমিটি (দখল পাওয়া গেলেও) বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিই। তাই পরবর্তী বছরগুলোতে জমির মূল্যের উপর আর যাকাত আদায় করিনি। বর্তমানে দলিলপত্র, খাজনা, ও নামজারিতে জমির মালিক আমি হলেও জমিটি দখলে পাওয়ার আশা একেবারেই ক্ষীণ। এখন প্রশ্ন হলো, ২০১১ ও ২০১২ সালে (দুই বছর) এই জমির মূল্যের উপর যে যাকাত আদায় করেছি তা আমার বর্তমান যাকাতের অর্থ থেকে বাদ দেয়া যাবে কি না?

উত্তর (ক) ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত পাওনা টাকা ব্যবসায়িক মাল গণ্য করা হয়। আর এ ধরনের পাওনা টাকা স্বতন্ত্রভাবে কিংবা মালিকানাধীন যাকাতযোগ্য অন্য কোনো সম্পদের সাথে মিলে নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর যখন তার উপর বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন তার উপর যাকাত ফরয হয়। প্রশ্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী বিনিয়োগকৃত টাকা এবং বিনিয়োগ ছাড়া সঞ্চয় করা উদ্ধৃত্ত আপনার নিকট যত টাকা আছে সেগুলোর উপর বছর অতিক্রান্ত হলে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। তবে বিনিয়োগকৃত টাকার যাকাত বছর অতিবাহিত ও উসূল হওয়ার পর এক চতুর্থাংশের চার ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করার অবকাশ আছে। এক্ষেত্রে একটা ফ্লোর ক্রয় বাবদ যে মূল্য আসে তার খরচ পরিমাণ টাকা যাকাত থেকে বাদ দেয়া যাবে না; বরং ঐ টাকাসহ যাকাতের হিসাব করতে হবে। কারণ ফ্লোর ক্রয় করার কথা একটা প্রতিশ্রুতিমাত্র, ভবন নির্মাণ সমাপ্তির আগ পর্যন্ত তার কোন কার্যকারিতা নেই। সুতরাং সে টাকা আপনার পাওনা বলেই গণ্য হবে। ভবন নির্মাণের পর ফ্লোর ক্রয়ের চুক্তি হলে তখন তার মূল্য যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের মধ্যে তার হিসাব করা হবে। (সূরা তাওবা- ৩৪, ফাতহুল কাদীর ২/১৭৬, ৬/২৬৫, বাদায়িউস সানায়ে ২/৪৬৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৬-২৩৭, ফাতাওয়া শামী ২/৩০৫, ফিকহুল বুয়ূ' ১/৭৭, ৫০৫, ৫০৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৫৪১)

(খ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা সম্পদের উপর যাকাত ফরয। কিন্তু পরবর্তীকালে বিক্রির সিদ্ধান্ত পরিহার করলে সেটা যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না এবং তার উপর যাকাত আদায় ফরয নয়। তাই আপনার দু'বছর ঐ জমির যাকাত আদায় করা যথার্থ হয়েছে। পরবর্তীকালে বিক্রির নিয়ত ছেড়ে দেয়ায় তা যাকাতযোগ্য থাকেনি। আর যেহেতু ২০১১-২০১২ সালে জমিটি যাকাতযোগ্য ছিলো কাজেই ২০১১-২০১২ সালে আদায়কৃত যাকাত বর্তমানের যাকাতে সমন্বয় করার সুযোগ নেই। (ফাতহুল কাদীর ২/১৭৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৬, ফাতাওয়া শামী ২/২৭২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৭)

হারুনুর রশীদ
মালিবাগ, ঢাকা

৪০৬ প্রশ্ন : আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের দূর্গাপূজার শুভেচ্ছাবার্তা সম্বলিত একটি

ম্যাসেজ সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেছি। সেই ম্যাসেজটি মূলত অন্য একটি পেইজকর্তৃক সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা হয়েছে। ম্যাসেজটির নমুনা নিম্নরূপ–

Wishing a very happy durga puja to everyone celebrating around the world. Share your beautiful embellishment outfit with us to get featured. #embellished.

অনুবাদ : 'সারা বিশ্বে আনন্দময় দূর্গাপূজা পালনকারীদের প্রতি আমার শুভ কামনা। বৈশিষ্ট্য পেতে আমাদের সাথে আপনার সুন্দর অলঙ্করণের পোষাকগুলি ভাগাভাগি করুন। #Embelished.

জানার বিষয় হলো, হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবে এভাবে শুভেচ্ছাবার্তা শেয়ার করার দ্বারা কি ঈমানের ক্ষতি হবে এবং আমার বিবাহ কি ঠিক থাকবে? আর এটা সংশোধনের উপায় কী?

উল্লেখ্য, উক্ত ম্যাসেজটি আমি না পড়েই এবং তাতে যে এমন বার্তা আছে সেটা না জেনেই শেয়ার করেছি। এটা যে দূর্গাপূজার শুভেচ্ছাবার্তা এতোটুকুও আমার জানা ছিলো না। আমার মোবাইলে কয়েকটি ম্যাসেজ আসে, আমি সবগুলো একসাথে শেয়ার করে দেই। তবে এতোটুকু জানা ছিলো যে, এগুলো একটি পোশাক কোম্পানীর ম্যাসেজ।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত বর্ণনা বাস্তব হলে, যেহেতু দূর্গাপূজার শুভেচ্ছাবার্তার কথা আপনি না জেনেই ম্যাসেজটি শেয়ার করেছেন, তাই আপনার ঈমানের কোন ক্ষতি হয়নি। চাইলে মনের প্রশান্তির জন্য কালিমা পড়ে ঈমান নবায়ন করতে পারেন। কারণ কালিমা পড়া সর্বাবস্থায় কল্যাণকর। তবে আগামীতে কখনো ম্যাসেজ শেয়ার করার প্রয়োজন হলে না পড়ে শেয়ার করবেন না। আর বিনা প্রয়োজনে এসব কাজে সময় নষ্ট করা মুমিনের জন্য কোনভাবেই উচিত নয়। (সূরা মায়িদা- ৫৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৯৭৬, ফাতাওয়া শামী ৪/২২৪, ২২৯, ২৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৫৭, ২৭৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/৩২০)

মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

৪০৭ প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব মসজিদে নিজ উদ্যোগে বয়স্কদের কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পর ঐ এলাকায় একটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মসজিদভিত্তিক বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেয়, তখন ঐ ইমাম সাহেবের মসজিদ কর্তৃপক্ষ উক্ত মসজিদকেও সেই ব্যাংকের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় এবং মাস শেষে ইমাম সাহেবকেও ব্যাংক থেকে বেতন প্রদান করা হয়।

জানার বিষয় হলো, ইমাম সাহেবের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বেতন গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

উত্তর : বেতন নিয়ে লোকদেরকে পড়ানোর জন্য মসজিদ ছাড়া ভিন্ন কোনো জায়গা না পাওয়া গেলে মসজিদে বেতন নিয়ে কুরআন শিক্ষা দিতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে মসজিদের আদবের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে।

ব্যাংকে হালাল-হারাম উভয় ধরণের টাকাই থাকে। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, উক্ত ইমাম সাহেবকে হারাম তথা সুদের টাকা থেকে বেতন প্রদান করা হচ্ছে, তাহলে তা নেয়া বৈধ হবে না। অন্যথায় ইমাম সাহেবের ইমামতি যেহেতু বৈধ কাজ সুতরাং নির্ধারিতভাবে সুদের টাকা হতে বেতন না দিয়ে কমন ফান্ড হতে বেতন দিলে এ বেতন গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। যদিও তাকওয়া এবং কুরআন শিক্ষার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের দাবি হলো ব্যাংক থেকে বেতন গ্রহণ না করা। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৮৮, মাজমাউল আনহুর ফী মুলতাকাল আবহুর ২/৫২৯, আল-মুহীতুল বুরহানী ৫/৩৬৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৯, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/২০১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২১, ফাতহুল কাদীর ১/৪২২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৪/২০৫-২০৬, কিতাবুল ফাতাওয়া ৪/১৫৭, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১৮/৪৩৫)

মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
মনিপুর, মোল্লাপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

৪০৮ প্রশ্ন : (ক) ছবিযুক্ত পণ্য যেমন মানুষের ছবি বা কোন জীব-জন্তুর ছবি, যেমন– হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। এমনিভাবে খেলনা জাতীয় জিনিস, যেমন– প্লাস্টিকের পুতুল, হাতি। কসমেটিকস জাতীয় জিনিস, যেমন– মেকআপ, নেইলপলিস ইত্যাদি পণ্য বিক্রি করার বিধান কী?

(খ) আমার বড় ভাই ইলেক্ট্রিক কাজ করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেন না। তিনি নেশা করেন এবং জুয়া খেলেন। বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে উঠাবসা করেন। মাঝে মধ্যে তার হাতে মোটা অংকের টাকা-পয়সা দেখা যায়। ঐ টাকা সে কোথা থেকে আনে, আমার জানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে মাঝেমধ্যে বলেন, জুয়া খেলে এনেছি, আবার কখনো কিছু বলেন না। ঐ টাকা তিনি আমাকে খরচ করার জন্য দেন।

জানার বিষয় হলো, আমার জন্য ঐ টাকা খরচ করা কি ঠিক হবে? কিংবা আমার কাছে রাখতে দিলে তা রাখা কি জায়েয হবে?

উত্তর : (ক) পণ্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে যদি উদ্দেশ্য হয় প্রাণীর ছবি বিক্রি করা– চাই তা মানুষের ছবি বা হাতি-ঘোড়া ইত্যাদির ছবি হোক কিংবা ছোটদের খেলনা হোক– এগুলো বিক্রি করা শরীয়তে বৈধ নয় এবং মূল্যও হালাল নয়। আর যদি উদ্দেশ্য ছবি বিক্রি করা না হয়; বরং বৈধ কোন পণ্য বিক্রি করা উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ ছবি পণ্যের সাথে বা প্যাকেটে অঙ্কিত হয়। তাহলে এ জাতীয় পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে যথাসাধ্য ছবি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করবে, স্বেচ্ছায় ছবি প্রদর্শন করবে না। এসব অবস্থায় পণ্য বিক্রির মূল্য হালাল হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫৪, ফিকহুল বুয়ূ' ১/৩২০, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৭/২৫০, ২৬০, ২৬৩, কিফায়াতুল মুফতী ১১/১১২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৩০২, ইমদাদুল আহকাম ৪/৪৪০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৪৬৪)

(খ) প্রশ্নের বর্ণনা মতে যেহেতু আপনার বড় ভাইয়ের রোজগার অধিকাংশ হারাম। এছাড়াও আপনার প্রশ্নের জবাবে সে টাকাগুলো জুয়ার টাকা বলে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে টাকা খরচ করা আপনার জন্য জায়েয হবে না; বরং সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোন গরীবকে দান করে দিতে হবে। আর হারাম টাকা রাখাও আপনার জন্য উচিৎ হবে না।

তবে আপনার ভাইয়ের দেয়া কোন টাকার ব্যাপারে আপনার যদি নিশ্চিত জানা থাকে যে, আপনার ভাই হালাল অর্জন থেকে আপনাকে খরচ করতে দিয়েছে, তাহলে তা খরচ করা আপনার জন্য জায়েয হবে। (আল-মুহীতুল বুরহানী ৫/৩৬৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১০৩)